আমরাও ইতিহাস গড়েছি

উর্মিলা পাওয়ার

[মারাঠা লেখিকা উর্মিলা পাওয়ারের জন্ম ১৯৫৪ সালে। মাহার জাতিগোষ্ঠির। বর্তমানে ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ। উর্মিলা পাওয়ারে আত্মজীবনী সারাদেশে ও দেশের বাইরে সাড়া ফেলে। ছোটগল্প, সমালোচনা, অনুবাদ সাহিত্যে সাবলীল। তার রচনা—(১) সহরবোট (গল্পসংকলন) (২) চৌথি বিহিস্ত (৩) হাটাচা এক (৪) উদ্যান (অনুবাদ) (৫) অযোদ্যাস (আত্মজীবনী) (৬) ডন একাঙ্কীকা (নাটক) ইত্যাদি।]

শৈশব, আর বেড়ে ওঠার দিনগুলি ঃ

উর্মিলা ঃ লতা আমাকে আমার আত্মজীবনী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছো। তোমরা তো আমার সম্বন্ধে জানো। আমি দলিত গোষ্ঠীর মানুষ। আমার মা পড়াশুনো করেননি, তিনি নিরক্ষর ছিলেন। আমি কোংকন থেকে এসেছি, আমার গ্রাম কোংকনে। আমার বাবা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী অবধি পড়েছিলেন। আমাদের গ্রামে সবাই ভাবত, তিনি অনেক পড়াশুনো করেছেন। তখনকার দিনে ষষ্ঠশ্রেণী অবধি পড়েও কাজ পাওয়া সম্ভব ছিল। তাই তিনি একজন শিক্ষক হয়েছিলেন। পড়ানোর কাজ ছাড়াও তিনি আমাদের গোষ্ঠীতে বিয়ে টিয়ে দিতেন। ব্রাহ্মণরা তো আর আমাদের গোষ্ঠীতে বিয়ে দিতে আসত না। তাই আমাদের গোষ্ঠীর যে কোনো শিক্ষিত মানুষই বিয়ে দিত। আমার বাবার পূর্বপুরুষরাও বিয়ে দিতেন। আমাদের গোষ্ঠীর মানুষরা তাই আমাদের বাড়ীতে বিয়ে করতে আসত আর আমরা কিছু টাকা ও চাল সেই সূত্রে পেতাম। এইভাবে, তাই, আমাদের জীবন কোনোভাবে কেটে যেত।

আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন আমার বাবা মারা গেলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন তাই তিনি জীবনে উন্নতির জন্যে যে শিক্ষার প্রয়োজন সে কথা খুব বুঝতেন। আমরা গ্রামে থাকতুম। বাবা রত্নগিরি শহরে কুঁড়েঘরের মত একটা ছোট বাড়ী করে আমাদের সেখানে নিয়ে আসেন। তাই জন্যে আমরা স্কুলে যাবার সুযোগ পাই। তারপর তো তিনি মারা গেলেন। কিন্তু আমার মাকে বলে গেলেন "যা পারো কোর, কিন্তু ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ কোর না, ওদের পড়তে দিয়ো।" তাই আমার মা একটি বিষয় খুব ভালো করে বুঝেছিলেন, তা হল, আমাদের পড়াশুনো করাতেই হবে। ওইটুকুই তিনি বুঝেছিলেন। আমরা পড়াশুনোয় ফাঁকি দিলেই তিনি খুব মারধোর করতেন। হ্যাঁ, কেমন করে মারতে

হয় তা তিনি বেশ জানতেন। আমার বাবা যখন মারা গেলেন তখন মাকে আমাদের ছ' ভাইবোনের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। একটি ভাই মারা গেল, তাই আমরা পাঁচ জন হলাম। আমরা হাইস্কুলে পড়তাম।

আমরা স্কুলে তো যেতাম কিন্তু আমরা ভরপেট খেতে পেতাম না। আমার মা তাই বেতের ঝুড়ি বুনতে আরম্ভ করলেন। এই তাঁর কাজ ছিল—বসে বসে ঝুড়ি বোনা। আমার ভাইটি মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় টাইফয়েডে মারা যায়। আমার সেই ভাইয়ের মৃত্যুর বেদনা আর আমার বাবার শোক মাকে প্রায়ই কাঁদাতো। তিনি কেবল কাঁদতেন আর ঝুড়ি বুনতেন। শুধুমাত্র আমাদের পড়াশুনোর ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল, আর কোনো ব্যাপারে নয়। আমরা খুব খারাপ খেতাম আর খুব সাধারণ জামাকাপড় পরতাম। হয়তো আমি চারপাঁচদিন স্নানই করতাম না। ধুলো কাদায় খেলা করতাম আর চুলে উকুনও ছিল। সেই উকুন মারার জন্যে জল ফুটনো হত আর ফুটন্ত জলে একটু ওয়াশিং সোডা মিশিয়ে চুল ঘষে দেওয়া হত, আর সেই ফুটন্ত জলে আমাদের চুল ধোয়া হত। মা তারপর একটা চিরুণী নিয়ে জোরে চুল আঁচড়ে দিতেন উকুন বার করার জন্যে। যখন সেই ফুটন্ত জল মাথায় ঢালা হত আর চিরুণী দিয়ে সজোরে চুল আঁচড়ানো হত তখন আমি যেন চোখের সামনে অনেক আগুনের ফুলকি দেখতাম। মা আমাকে মারধোরও করতেন। এইভাবে কোনোমতে আমরা বেঁচে ছিলাম।

আমাদের চারিদিকে মারাঠা, ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি অন্যান্য জাতের লোকেরা থাকত। তারা সব আমার মাকে ঝুড়ি বুনতে বলত (তাদের জন্যে)। যেহেতু আমি সবচেয়ে ছোট ছিলাম, মা সবসময় আমাকেই সেই ঝুড়িগুলো লোকের বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দিতে বলতেন। আমি যেতাম বটে কিন্তু তারা আমাকে বাড়ীর বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখত। তারপর তারা ঝুড়ির ওপর জল ছিটিয়ে সেগুলো ঘরে তুলত। টাকাও তারা ওপর থেকে আমার হাতে ফেলে দিত। আমি সত্যিই খুব ব্যথা পেতুম তাদের ব্যবহারে। মাকে বলতাম যে আমি আর যাব না ঝুড়ি পৌঁছে দিতে যেমন আমি লিখেছি (আমার গল্পে), আমি স্কুল পালাতাম। স্কুল পালানোর জন্যে মাষ্টারমশাই মারত খুব। সেও জাতিভেদ মেনে চলত আর আমাকে ক্লাসের সর্বশেষ পংক্তিতে বসাত।

আমার একটি বড় বোন ছিল। তার যখন বিয়ে হয় তখন আমার বাবা বেঁচে ছিলেন। তার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা এই রকম ছিল তারা এত গরীব ছিল যে যখন তারা খেতে বসত তখন তারা একটাই থালা থেকে খেত, আর খাবার মেপে মেপে খেত। জনা তিন চার ভাই ছিল। তারা খেতে বসত আর সেই সঙ্গে তর্ক করত

'ক' গ্রাস তুমি খেলে? কতগুলো দানা তুমি নিলে? তুমি চুরি করে নিয়েছ?" যদি কেউ একটু বেশী খেত তাহলে তা নিয়ে এক বিরাট ঝগড়া বেধে যেত। তাই তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'হা-ভাতের দল'। এই সব কারণে তাদের বাড়ীতে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে চাইত না। কিন্তু আমার জামাইবাবু সেই বাড়ীর ছেলে হয়েও সপ্তম শ্রেণী পাশ ছিল। বাবা ভেবেছিলেন হয়তো সে শিক্ষক হতে পারে। তাই তার সঙ্গে আমার দিদির বিয়ে দিয়েছিলেন। জামাইবাবু খুব কালো ছিল- সত্যিকারের "কেলে কেষ্ট"। দিদির তো বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সে ওদের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলত। ওরা চুরি করে রুটি মাচার ওপরে লুকিয়ে রাখে আর তারপর একজন আরেকজনের রুটি চুরি করে খায়। তারা খাবার জন্যে এতদূর পর্য্যন্ত ঝগড়া করত। আমাদের মধ্যে এমন প্রবাদ আছে, যে, যদি ঝগড়াঝাঁটির আওয়াজ শোনা যায় আর কেউ জিজ্ঞেস করে কারা ঝগড়া করছে? তার উত্তর হয় "কেউ নয় ঐ মাহাররা খেতে বসেছে।" খাওয়া নিয়ে ঝগড়া হত বলেই এই প্রবাদের চল হয়।

আমার বাবা দিদিকে বলতেন যে তার চাকরি করা উচিত। দিদি চতুর্থ না পঞ্চম পর্য্যন্ত পড়ে স্কুল ছেড়েছিল। দিদি টুকটাক কাজের খোঁজে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করত অবশেষে একটা মানসিক হাসপাতালে আয়ার কাজ যোগাড় করল। সেই হাসপাতালে এই হয়েছিল যে সেখানের ম্যাডাম জাতিভেদ সম্বন্ধে সচতেন ছিলেন। তাই দিদি বলত যে সে ওখানে চাকরি করতে চায় না। "ওরা আমাকে ছুঁতে দেয় না, আমার রান্না খাবার খায় না।" এই সব নালিশ করত। বাবা বলতেন "দেখ, তোমাকে এসব সহ্য করতে হবে। ওরা তো পাগল। তুমি পাগলের কথায় কান দাও কেন?" আস্তে আস্তে দিদি মানিয়ে নিতে শিখল আর চাকরি বজায় রাখল। দিদির স্বামীও শিক্ষকের কাজ পেয়ে গেল।

এটা ভালো হয়েছিল যে বাবা আমাদের শহরে নিয়ে এসেছিলেন। এতে আমাদের অনেক লাভ হয়েছিল। ক্লাসের ব্রাহ্মণ ও মারাঠা ছেলেমেয়েদের দেখে আমরা ধরণধারণ রীতিনীতি আচরণ খাওয়াদাওয়ার প্রকৃতি জামাকাপড় পরিষ্কার রাখার অভ্যাস এই সবই শিখেছিলাম। নিজের বাড়ীতে আমরা কখনো ওই ধরনের খাবার খাইনি। সেই সব খাবার রাঁধার প্রণালীই আমাদের জানা ছিল না। আমরা খেতাম রুটি আর মাছ। কারণ আমরা কোংকনের মানুষ তো, কিন্তু যে মাছ আমরা খেতাম তা বেশ খারাপ জাতের মাছ। হালওয়া বা পমফ্রেটের মতন বড় মাছের স্বাদ তো আমরা জানতামই না। অন্যদের বাড়ী গিয়ে লাড্ডু ও আরো সব সুখাদ্য, যা দেওয়ালীর সময় তৈরী হয়, সে সব করতে শিখতাম। কিন্তু বাড়ীতে যদি ওসব

তৈরী করতে যেতাম তবে মা বকতেন কারণ ও সব করতে গেলে প্রচুর তেল ময়দা লাগে। তাই মা করতে দিতেন না। আর মনখারাপ করে কাঁদতে আরম্ভ করতেন।

সাধারণত বাড়ীর পুরুষরা উপস্থিত না থাকলে ভালো খাবার রান্না হত না আর যা হোক কিছু খেয়ে নেওয়া হত। এখনো, অনেক পরিবারে, যদি পুরুষরা না খায় আর শুধু মেয়েরা থাকে, তবে তারা যেমন তেমন করে রান্না সেরে নেয়। তাই, সেই সময়ে আমাদের বাড়ীতে, কি খাচ্ছি তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আমসুল (কোকাম) ছিল-সেটা জলে ভিজিয়ে আমরা তার ঝোল করতাম অথবা ঝিনুক গুগলীর ঝোল। হয় এই রান্না আর নয়তো ছিল শুট্‌কি মাছ। সব থেকে খারাপ মাছ দিয়ে ঝোল করা হত। তাই খেতাম। পেটখারাপ হওয়ার খুব সম্ভাবনা ছিল, আর হতও তাই। তবু গরীব ঘরের মেয়েরা এই খাদ্যই খেত।

মা আমাকে খুব মারতেন আর সময়ে সময়ে খুব নিষ্ঠুর হয়ে যেতেন। আমার তো তাঁকে শত্রু মনে হত। তখন মাকে অপছন্দ ছিল কিন্তু এখন পেছন ফিরে তাকাই যখন, মার মনের গতিটা যেন বুঝতে পারি। এখন বুঝি যে তিনি না থাকলে আমরাও থাকতাম না। এখন বুঝি তিনি আমাদের কতখানি দিয়ে গেছেন। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমি চোখের জল সামলাতে পারছি না। আজ আমি তাঁর মহত্ত্বতার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারি। তখন পারিনি। হ্যাঁ তোমাদের বিনোদ কাম্বলির কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। বিনোদ কাম্বলির বাবা একজন কাবাডি খেলোয়াড় ছিলেন, খুব নামকরা কাবাডি খেলোয়াড়। রণোদ্ধার সঙ্ঘের তিনি সদস্য ছিলেন। এরা রত্নগিরিতে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করত এবং একটা ট্রফি দিত। তিনি সেখানে আসতেন। বিরাট ভীড় হত খেলা দেখবার জন্যে। আমিও ছুটে যেতাম খেলা দেখতে। ভীড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম। তিনি আমাদের আত্মীয় ছিলেন। আমার প্রতি খুব স্নেহশীলও ছিলেন। আমাকে কোলে তুলে নিতেন। যদি সঙ্গে কোন মিষ্টী থাকতো তবে তা আমাকে দিতেন। আমার বেশ লাগত ব্যাপারটা। আমাদের স্কুলের কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি বেশ অহঙ্কার বোধ করতাম। সেই সময় একবার আমার মা অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে বাড়ীতে থাকতে হত, আর আমি এমন নির্মায়িক ছিলাম যে তাঁর দেখাশুনোও করতাম না। তাঁর খাবারে রুচি ছিল না। একদিন মা আমাকে মাছ আনতে বললেন। মা বললেন "বাজারে গিয়ে একটু মাছ নিয়ে এসো।" কাজটা আমার পছন্দসই হল কারণ খেলার প্রতিযোগিতাটা বাজারের জায়গাতেই হচ্ছিল। আমাদের বাড়ীটা বাজার থেকে বেশ দূরে ছিল। তাই কেউ বাজারে গিয়ে মাছ

কিনতে চাইত না। আমি তক্ষুনি পয়সা নিয়ে বললুম "আমি আনছি মাছ।" বাজারের থলি নিয়ে যখন যাচ্ছি তখন মা বললেন, "ভালো করে দেখেশুনে মাছ কিনো, আঙুল দিয়ে টিপে দেখো," আরো যা যা বলে। আমি গেলাম কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল খেলা দেখবার ভাবলাম যদি গিয়ে খেলা দেখতে দাঁড়িয়ে যাই তবে সব মাছ হয়তো বিক্রী হয়ে যাবে। তাই ঠিক করলাম যে আগে মাছটা কিনে তারপর খেলা দেখতে যাব। সেই বুঝে মাছওয়ালা যে মাছ দিল তা কিনলাম। তারপর খেলা দেখতে গেলাম আর দেখতেই থাকলাম। ওরা প্রতিযোগিতা জিতল আর সবাই দারুন উত্তেজিত হয়ে ছিল তখন। আমি তো জগৎসংসার ভুলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল মা তো মাছ আনতে বলেছিলেন। বাড়ী গেলাম কিন্তু ততক্ষণে মাছটা পচে গেছে আর মা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তখন খুব খারাপ লেগেছিল। মা তো গালাগাল দিলেন। আমি এতটাই নির্মম হয়ে পড়েছিলাম তখন। সত্যি মায়া-মমতাহীন। আজ যখন বুঝি মা কি জিনিষ তখন তাঁর কষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। তোমাদের তো আমার ছেলের মৃত্যুর কথা বলেছি। আমার মা যখন কাঁদতেন তখন তো আমি তাঁর ওপর রেগেই যেতাম। ভাবতাম তিনি ভালো কিছু রান্নাবান্না করেন না। আমাকে কিছু দেন না। এইরকমই ভাবতাম। কিন্তু আজ তাঁর কষ্ট বুঝতে পারি।

লখ্‌ষ্‌মী ঃ আপনার ছেলেবেলায় আশেপাশের যে মেয়েরা ছিলেন তাদের সম্বন্ধে একটু বলবেন? কি ভাবতেন তাঁরা, কেমন ভাবে দিন কাটাতেন?

উর্মিলা ঃ যা বলেছি আগে, বাবা আমাদের শহরে এনেছিলেন। তারপর আমরা তো গ্রামের মেয়েদের দেখলে অপ্রস্তুত বোধ করতাম কারণ গ্রামের মেয়েরা শাড়ি হাঁটুর ওপর তুলে পরতো। তাদের দেখে আমি ভাবতাম "এরা যে আমার আত্মীয়, এ কথা কাউকে জানতে দেব না।" অল্প বয়সে এমনটাই ভাবতুম। কখনো কেউ যদি জিজ্ঞেস করত ও কে? তখন সে আমার মাসীপিসী হলেও বলতাম "আমাদের গ্রাম থেকে এসেছে।" তখনকার দিনে মানুষ বড় পিছিয়ে ছিল। ভালো খেতে পেত না। তাই মেয়েদের জীবনের মেয়াদও ছিল কম। পঞ্চাশ হতে না হতে মেয়েরা বুড়ী হয়ে যেত। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের মেয়েদের বুড়ো বলা হত। লোকে বলত, "ওই বুড়ীটা"। এখন তো সত্তর আশী বছরের মহিলাদেরও কেউ বুড়ী বলতে চায় না। আমরা তাঁদের মাসীপিসী বলে ডাকি, বিদেশে তো তাও বলা হয় না। আমরা এখন নিজেদের বুড়ো বলে মনেও করি না। কিন্তু আগেকার দিনে তো তা হত না। মেয়েরা তখন শীঘ্র মারা যেত। গর্ভবতী অবস্থাতেও তারা শোচনীয় অবস্থায় থাকত। কেউ তাদের দেখাশুনো করত না। কিছুই করা হত না। এখন কোনো মেয়ে প্রসূতি হলে আমরা কতগুলো সেলাই পড়ল, কতগুলো সেলাইয়ের দরকার আছে, এই সব

নিয়ে কথা বলি। তখনকার দিনে কি করা হত? প্রসবের সময় চিরে টিরে গেলে, একটা কাপড় নিয়ে, সেটা নূনজলে ডুবিয়ে, একটু তেল তার ওপরে ঘষে সেটা পাট করে প্রসূতিকে দেওয়া হত আর তাকে খুব যন্ত্রণা সহ্য করতে হত। নূনের প্রতিষেধক গুণ আছে। গরম সেঁকও দেওয়া হত। জ্বলন্ত কয়লা একটা তোলা উনুনে থাকত আর প্রসূতি সেই ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস নিত। প্রসূতির শোয়ার ব্যবস্থা যতটা সম্ভব সেই উনুনের ওপরেই হত। নইলে সবাই বলত "শরীর নিঙড়ে যাবে"। অর্থ্যাৎ বায়ুমুক্ত হবে আর সেই ক্রিয়ায় তো আওয়াজ হবে। প্রসূতির সর্বরকম আওয়াজ করা বারণ। প্রসূতির নিম্নাঙ্গে যতটা গরম সম্ভব ততটা গরমজল ঢালা হবে। এর মানে হল যে প্রসবের ব্যাপারটা ভীষণ কষ্টকর ছিল মেয়েদের জন্যে। কোনো প্রসূতির প্রসবের সময় সন্তানের হাত বা পা বেরিয়ে আসত, ডাক্তার তো থাকত না, সুতরাং প্রসূতি মারা যেত। মেয়েদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। বড় হতে হতে দেখেছি আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে সব মেয়েদের জীবনের মেয়াদ খুব স্বল্প। আমার মাসী মারা গিয়েছিলেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তারা যক্ষা অথবা হাঁপানিতে ভুগতো। অন্যান্য রোগ, যেমন কলেরা কি বসন্ত, ছড়িয়ে পড়ত আর বহু মেয়ে এর থেকে মারা যেত। মেয়েরা তো মরত আর তারপর পুরুষদের (অবশ্যম্ভাবী) দ্বিতীয় বিয়ে হত। আমার বহু আত্মীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বিয়ে করেছে। মেয়েরা তো স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছুই জানত না। নাকটা ঝেড়েই সেই হাতে রুটি দিতেন। যদি আমি বলতুম "নানা রোগের বীজাণু থাকতে পারে।" তিনি বলতেন, "কোথায় বীজাণু? দেখতে পাচ্ছ কিছু?" আমার পেটে দাদ হয়েছিল, সেটাকেও 'খান্ট' (বীজাণু) বলা হত। তিনি ভাবতেন শুধু এগুলোই বীজাণু। এই সব বীজাণু টীজাণুর ব্যাপার উনি কিছুই বুঝতেন না।

মনে আছে, আমার মার এক মাসী ছিলেন। তিনি মাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি যখন আসতেন তখন আমার মার ভালবাসাও বোঝা যেত। সেই মাসী একলা থাকতেন। তিনি এলে একটা স্নানপর্ব হত। তাঁকে স্নান করানো হত। ভালো কাপড়জামা দেওয়া হত। "ভালো" মানে আমার মার ধারণায় যা ভালো। আসলে সেগুলো ধোয়া কাপড়, একটু সাবানে ধোয়া। সেই ভালো জামাকপড় আমরা তাঁকে দিতাম। আর স্নান করানো হত কেমন করে? সেই স্নান করানোয় অনেকখানি ভালবাসা থাকত। তাঁকে বসানো হত। জল গরম করা হত, আর শুকনো নারকোলের শাঁস — সাবান নয় শুধু নারকোল, ব্যবহার করা হত। মা একফালি নারকোল কেটে সেটা চিবিয়ে নিজের হাতে ফেলতেন। আর সেই চেবানো নারকোল দিয়ে মাসীর হাত আর শরীর খুব রগড়ে দেওয়া হত। আমরা ছোট ছিলুম নারকোলের

ব্যাপারটা বুঝতুম না। মাসী তো তাঁর গ্রামে ফিরে গিয়ে বলতেন, "আমার বোনঝির কাছে গিয়েছিলুম। সে আমাকে চেবানো নারকোল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিয়েছে।" আমাদের চায়ে চিনি থাকতো না। আমরা গুড় দিয়ে চা খেতাম। দুধ তো ছিলই না। আমাদের চা দুধ ছাড়া হত। শহরে থাকতাম বলে একটু চিনি পেতাম। মাসীকে চিনি মেশানো চা দেওয়া হত। মাসী তো অভিভূত হয়ে পড়তেন। আমার মাকে আরো ভালবাসতেন। আমার মার কথা তো বলেছি। মা অশান্তিতে ছিলেন, দুঃখী ছিলেন। ছেলে মারা গিয়েছিল, আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন, মা কাঁদতেন আর বেতের ঝুড়ি বুনতেন।

আমাদের গ্রামের মেয়েরা ঘার কিংবা কাঠ বিক্রী করতে শহরে আসত। আমাদের বাড়ী রাস্তার ওপরেই ছিল। বাবা আমাদের বাড়ীতে একটা কূয়ো খুঁড়েছিলেন। বাজারে ওই মেয়েদের কেউ জল খেতে দিত না। তাদের খুব কষ্ট হত। নিজেদের বাড়ী থেকে তারা ভোর চারটেয় রওনা হত। আট-দশ মাইল খালি পায়ে হেঁটে আসত। পা ফেটে যেত, ধূলোমাখা শরীর, মাথায় চুলে জট পড়ত, আর তাদের যথেষ্ট কাপড় চোপড়ও ছিল না। জল পেত না। বাবা আমার মাকে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন যে ওই মেয়েরা যেন সর্বদা আমাদের বাড়ীর কূয়ো ব্যবহার করতে পারে। জল তোলবার জন্যে যে দড়ি বালতি দরকার তাও যেন ওই মেয়েদের হাতের কাছে থাকে। কিন্তু মা ছিলেন গরীব আর কৃপণ। দড়িটা কুয়োয় ঝুলিয়ে রাখতে চাইতেন না কারণ ক্রমাগত ব্যবহার করলে দড়িটা সহজেই ছিঁড়ে যাবে। তাঁকে আবার দড়ি কিনতে হবে। তাই তিনি দড়িটা খুলে সরিয়ে রাখতেন। আর বাবা মার ওপরে এই নিয়ে খুব চটে যেতেন। যে মেয়েরা জল খেতে আসত, তারা বসে বসে তাদের রুটি চাটনি দিয়ে খেত। আমি বাড়ী থেকে পিঁয়াজ চুরি করে ওদের দিতাম। মা টের পেলে আমার ওপর খুব রেগে যেতেন। ওই মেয়েরা এসে মাকে গ্রামের সব কেচ্ছাকাহিনী বলত। মা ঝুড়ি বুনতে বুনতে শুনতেন। আমার মার একটা গুণ ছিল-তিনি যা শুনতেন তা অপর কাউকে বলতেন না। ঠিক একটা খবরের কাগজের ছাপাখানার মত। সব খবর ছাপাখানায় পৌঁছয় কিন্তু সব ছাপা হয় না। মা এই ভাবে শুনে যেতেন। ওই মেয়েরা সব আসত। "আমার স্বামী ওই করেছে আমার স্বামী এই করেছে।" "আমার শাশুড়ী ওই করেছে।" ওরা সব হাত নেড়ে, পান খেতে খেতে আর পিক ফেলতে ফেলতে গল্প শোনাত। মা উঠোনে একটা ছোট গাছের নীচে বসে ঝুড়ি বুনতে বুনতে শুনে যেতেন। মাঝে মাঝে আমি ভাবি যে, যদি (গ্রামোফানের মত) সেই ঝুড়িগুলোর বুনুনির ওপরে পিন বসিয়ে

ঝুড়িগুলোকে ঘুরিয়ে দেওয়া যেত, তবে তারা সেই মানুষদের কত কাহিনীই না আমাদের শোনাত। আমরা সে সব শুনতে পেতাম।

আমার দিদির কথা তোমাদের বলেছি। সেই দিদি মানসিক হাসপাতালে কাজ পেয়েছিল। কাজের মধ্যে মধ্যে সে বাড়ী আসত তার বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে। সে সময় আমার মারও ছেলেপুলে হচ্ছিল। মা-মেয়ে একই সময় সন্তানের জন্ম দিচ্ছিল। আমরাও ছোট ছিলাম আর আমার বোনপোরাও ছোট ছিল। তিনটি বোনপো ছিল আর আমরা ছোট তিন ভাইবোন ছিলাম। প্রায় একই সময় আমাদের জন্ম হয়েছিল। এ বছর একজন ও বছর একজন এইভাবে। দিদির খুব দুধ হত। সে নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ী আসত ছেলেদের দুধ খাওয়াতে। ওর বাচ্চারা খুব ছোট ছিল তাই দুধও তাড়াতাড়ি খেয়ে নিত। তারপর দিদি আমাদের ডাকত, "আয় তোরা, তোরাও দুধ খা।"

আমরা দিদির স্তন্যপান করেছি। আমরা একটু বড় হওয়া সত্ত্বেও দিদির দুধ খেয়েছি। আমি আমার মার স্তন্যপান করেছি সাত বছর বয়স অবধি। মা বসে বুনতেন আর আমি পাশ থেকে স্তন্যপান করতাম। জানি না, হয়তো সে জন্যেই আমি এত শক্তপোক্ত হয়েছি।

উঁচু জাতের মেয়েরা আমাদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করত। আমার আত্মজীবনীতে তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার কথা আমি নিশ্চয়ই বলব। আমার মা যখন অসুস্থ হয়ে পড়তেন— তাঁর সারা গায়ে ফোড়া হত। কখনো আবার খুব গ্যাস হয়ে পেটে ভীষণ যন্ত্রণা হত। মা-র নানারকম অসুখ ছিল। তাঁকে কখনো সুস্থ দেখিনি। কিন্তু অসুস্থ হয়েও তিনি ঝুড়ি বোনার কাজ কখনো বন্ধ করতেন না। শুধু যখন অসুখ খুব বেড়ে যেত তখন তিনি ঘুমোতেন। বাবার এক বন্ধু ছিল। তারা জাতে স্বর্ণকার। আমের ব্যবসা করতো। অবস্থাপন্ন ঘর। তারা আমাদের বলে রেখেছিল যে যখন মা খাবার খাবেন না— অসুস্থ থাকলে মা বিশেষ খেতেন না— তখন যেন আমরা তাদের বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসি। আমি যখন যেতাম তখন বাড়ীর লোকেরা আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করত। কখনো ভিখিরী ভাবত না। বলত "হ্যাঁ বাছা, এসো এখানে দাঁড়াও। ঠিক আছে।" তারপর তারা ভালো খাবার দিত। এঁটো পাতের ফেলা খাবার নয়। ভাত, ডাল, দই ঘোল এই সব দিত আমাদের। আমি বাড়ী আনতাম। মা বিশেষ খেতেন না। আমি খেতাম। এই সব হত।

আমাদের বাড়ীর সামনে একটি ব্রাহ্মণ পরিবার থাকত। দু বাড়ীর মাঝখানে একটা রাস্তা ছিল, তার ওপাশে তাদের বাড়ী। তারা আচার তৈরী করত। জানো তো, ব্রাহ্মণরা আচার তৈরী করে। আমাদের বাড়ীতে কি জুটবে? কেবল শুঁটকি

মাছ। বাড়ী ঢুকলেই তুমি গন্ধ পাবে। মা-র যখন খেতে ইচ্ছে করত না, তখন আমাকে দু'এক পয়সা দিয়ে বলতেন "যাও, একটু আচার নিয়ে এসো।" আমি তো আচার আনতে যেতাম। ব্রাহ্মণদের আচার বোয়ামে রাখা থাকে আর বোয়ামের মুখ কাপড়ে বাঁধা থাকে। প্রত্যেকবার বোয়াম খোলা এক পর্ব হত। আমি গিয়ে বলতাম "বাড়ী আছে কেউ? আমার আচার চাই।" যেন আমি চুরি করতে বা ভিক্ষে চাইতে এসেছি। "দু' পয়সার আচার চাই," আমি বলতাম। তখন কেউ উঁকি মেরে দেখত আর শেষমেষ কোনো মেয়ে আসত। অনেক সময় নিয়ে আচারের বোয়ামটা বের করে আনতো। পয়সা নিত। এই পর্ব বহুক্ষণ ধরে চলত। আমার ভাই বলত, "তুই পাগল, বোকা, বুদ্ধ। তোর পেছন দিকের উঠোন দিয়ে যাওয়া উচিত। বলবি "আচার কই? আর নিজে নিজেই আচার বের করে নিবি। বোয়ামের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিবি। তাহলে ওরা সবটাই তোকে দিয়ে দেবে। পূরো বোয়ামটা তোর হয়ে যাবে। তোর এই রকম করা উচিত।" আমরা এই নিয়ে খুব মজা করতাম।

অভিনয়ের রোমাঞ্চ আর বিবাহ—

লক্ষ্মী ঃ হাইস্কুলের পর আপনি পরবর্ত্তী শিক্ষা কেমন করে পেলেন? কেমন করে বিয়ে হল?

উর্মিলা ঃ হাইস্কুল অবধি আমি রত্নগিরির এক স্কুলে পড়েছি। স্কুলের অনুষ্ঠানগুলিতে আমি অংশ নিতাম। এখন যেমন লোকে বলে দলিতদের উৎসাহ দেওয়া উচিত, তাদের সমস্যা নিয়ে ভাবা উচিত, তাদের জন্যে কিছু করা উচিত, পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের কোনো মেয়ে যদি নাচতে, গাইতে বা অন্য কিছু করতে পারে তাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। আমার শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ এমনটিই ভাবতেন। আমি ডিবেটে আর অভিনয়ে অংশ নিতাম। আমি নবম বা অষ্টমশ্রেণীতে ছিলাম। একটা নাটক করা হল আর আমাকে রাজার ভূমিকা দেওয়া হল। তখন আমি একটু মোটা ছিলাম। এটা ওটা খেয়েই যেতাম। একটু বেশীই খেতাম। তাই আমাকে রাজার ভূমিকা দেওয়া হল। সেটা হাসির নাটক ছিল। গোবিন্দ রাও নেমে নামে আরেকজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মেয়ে আমার ক্লাসে পড়ত। তাকে চাকরের ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। তা, তিনি মনে করলেন যে আমাকে চাকরের ভূমিকা আর তাঁর মেয়েকে রাজার ভূমিকা দেওয়া উচিত। আমাদের মাস্টারমশাইদের সঙ্গে তিনি ঝগড়া করতে আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু মাস্টার মশাই যিনি নাটকের নির্দেশনা দিচ্ছিলেন আর তিনি বললেন যে এই মেয়েটিকে ওই ভূমিকায় মানাবে তাই তাকে রাজার ভূমিকাটা দেওয়া হবে। ফল হল কি, আমার ইংরিজীর মাস্টার মশাই সারাক্ষণ আমার খুঁৎ ধরতেন।

নাটকটা যেহেতু হাসির ছিল তাই আমাকে একধরনের মোটা গলায় কথা বলতে হত। ওই ভাবে কথা বলে আমার গলা ধরে গেল। মাস্টার মশাইয়ের একজন মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে ভালবাসা ছিল। তিনি মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তিনি বললেন "গলা ধরে গেছে ওর? দাঁড়াও ওষুধ স্প্রে করে দিচ্ছি।" স্প্রে করার পর গলাটা ভালো হল। এরকম বেশ কয়েকবার করা হল কারণ আমরা নাটকটা রত্নগিরির বিভিন্ন জায়গায় মঞ্চস্থ করেছিলাম। আমি একটা মেডেলও পেয়েছিলাম। আমার ছবি স্কুলে টাঙানো হয়েছে। জানি না হয়তো স্প্রে করার জন্য আমার গলাটা মোটা হয়ে গেল। তখন এটা বুঝিনি। কিন্তু পরে সর্দিকাশি লেগে থাকত। বারবার গলা ধরে যেত। একজন ই.এন.টি বিশেষজ্ঞ জিজ্ঞেস করলেন, "ছোটবেলায় কি গলায় অপারেশন করা হয়েছিল?" আমি বললুম, "না, অপারেশন হয়নি, তবে এই ব্যাপার হয়েছিল।" তিনি বললেন আমার স্বরনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। এখন যখন ভাবি তখন (মনে হয়) যদি নেনের মেয়ে রাজা হত তাহলে নেনে কি মেয়ের গলা স্প্রে হতে দিতেন? তিনি শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন। আমার জন্যে আমাদের বাড়ীতে কার মাথাব্যথা ছিল? আমার গলা ধরে গেছে, কি জন্মের মত গেছে, তাতে কারো কিছু এসে যেত না। এইবারে হাইস্কুলে অভিনয়ে আমি অংশ নিয়েছিলাম। শান্তাবাঈ যোগ এসেছিলেন। তিনিও একটা নাটকের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তাতেও আমি অভিনয় করেছি। মাধ্যমিক পর্য্যন্ত এইসব অনুষ্ঠানে আমি অংশ নিয়েছি।

বাবা মাকে বলেছিলেন, যে, সব ছেলেপুলেরা যেন পড়াশুনো করে এবং যেন চাকরি করে। বাবার আরেকটা ইচ্ছে ছিল যে তাঁর মেয়েরাও যেন চাকরি করে। তিনি চাইতেন যে মেয়েরা চাকরি করার জন্যে যেন যথেষ্ট যোগ্য হয়। আমি যখন চাকরি নিলাম তখন আমার পড়াশুনো বন্ধ হয়ে গেল। চাকরি নিলাম আর বিয়েও করলাম। আমার মনে হল যে কোনো কলেজে ভর্ত্তি হয়ে আরো পড়াশুনো করব। তিনটি সন্তান হওয়ার পর কলেজে ভর্ত্তি হলাম। পড়াশুনো স্নাতকোত্তর পর্য্যন্ত করলাম বটে কিন্তু আমার মনে হয় মা হিসেবে আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমি কাজ করছিলাম, কলেজে যাচ্ছিলাম। পড়াশুনোর দিকেই নজর ছিল আর ছেলেপুলেদের অবহেলা করেছি। আমি ওদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিইনি। কেবল তাদের খাওয়া আর পড়ার ব্যাপারে দেখাশুনো করতাম, ঠিক যেমন আমার মা করতেন। তাদের মনের বিকাশ, মায়ের সঙ্গ, তাদের ভালো শিক্ষা দেওয়া, তাদের জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করা, এই সবই একটা বয়সে করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি করিনি। আমার স্বামীর ধারণা ছিল যে বেশী টাকাপয়সা খরচ করা ঠিক নয়। তাই তাদের

মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পাঠানো হত সপ্তমশ্রেণী পর্য্যন্ত তারা এই স্কুলে পড়েছে। মিউনিসিপ্যাল স্কুলের অবস্থা তোমাদের গিয়ে দেখে আসা উচিত। দিদিমণিরা বসে সেলাই করে আর ছেলেরা যা খুশী করে। শিক্ষিকারা পরচর্চা করে "এরা বস্তী থেকে এসেছে, এদের শরীরে দুর্গন্ধ, দেখতেও নোংরা আর থাকেও নোংরা। দূরে দূরে রাখ, ছুঁয়ো না যেন" এই মনোভাব। সুতরাং ছেলেদের পড়াশুনো কিছুই দেখাশুনো করা হয় না। আমার সন্তানরা এইরকম স্কুলে পড়েছে আর এই জন্যে আমি মনে করি মা হিসেবে আমি ব্যর্থ হয়েছি। আজ আমার ছেলেপুলেরা যা হয়েছে, তারা যা সহ্য করেছে, তাদের যা দোষ, আমি মনে করি সে সবই আমার দোষে হয়েছে।

আমার বিয়ের ব্যাপারে—আমরা তিন বোন। দিদির বিয়ে বাবা বেঁচে থাকতেই হয়ে গিয়েছিল। অন্য বোন খুব কালো এবং খুব রোগা ছিল। তার দাঁতও উঁচু ছিল। তাই তার বিয়ে হওয়া একটা বিরাট সমস্যা ছিল। তার বিয়েও হচ্ছিল না। আমার ভাই বম্বেতে একটা কাজ যোগাড় করেছিল। সে ভাবলো যে উঁচু দাঁতের জন্যে বোনের বিয়ে হচ্ছে না, তার দাঁত তুলিয়ে দেওয়া উচিত। সে বোনকে বম্বে নিয়ে গিয়ে সত্যি সত্যিই দাঁত তুলিয়ে নকল দাঁত বাঁধিয়ে দিল। ভালো হয়েছিল। দাঁত তোলাবার পর বোনের বিয়ে হয়েও গেল। বি.আই.টি চৌলে ও সংসার পাতলো আর অফিসে কাজও করছিল। বিমানবাহিনী অফিসে তার কাজ সকাল সাতটায় আরম্ভ হত। তার শ্বশুর শাশুড়ী নিরক্ষর ছিল। ওরা ভাবত অফিসে গিয়ে তো চেয়ারে বসে থাকে তবে ক্লান্ত কেন হয়ে পড়ে? ভাবত চেয়ারে বসে বিশ্রাম করে আর বাড়ী ফিরে আসে। তাই তারা বাড়ীর সব কাজ আমার বোনের জন্যে রেখে দিত, বাসন মাজা আর আরো সব। তারা ভাবত কি করে ক্লান্ত হতে পারে? বোনকে কষ্ট দিত। বোনের স্বামী বি.এ.পাশ করেছিল বটে কিন্তু সে আমার বোনকে মারত। যখন আমার বোন গর্ভবতী ছিল তখন সে তাকে হুকুম করত শিগ্‌গীর ওঠ। আর না উঠলে তাকে লাথি মারত। দলিতবর্গের পুরুষরা মানবিকতার প্রশ্ন নিয়ে লড়াই করে কিন্তু মানবিকতা কি তা ওরাও জানে না কারণ নিজেদের স্ত্রীর প্রতি কোনো মানবিকতা দেখায় না। এই জন্যে তোমাদের এই উদাহরণটা দিলাম।

আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমি স্কুলে ছিলাম। মা পাশের একটা ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন কিছু টাকা উপার্জন করার জন্যে। একটা পরিবার সেই ঘরে থাকত। আমার স্বামী সেই পরিবারের একজনের বন্ধু ছিল। অফিসেও কাজ করত। ও পাশের ঘরে আসত। যখন আসত তখন দেখত এই মেয়েটা চালাক আর চট্‌পটে তাই আমাকে পছন্দ করল। আমাদের আলাপ হল, ক্রমে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। আমরা বিয়ে করলাম।

লেখা আর জীবন ঃ

লতা ঃ আমি এবারে উর্মিলাজীকে জিজ্ঞেস করব কবে থেকে তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন আর লেখার মাধ্যমে তাঁর কি অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাঁর লেখা তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাঁর সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বেশী কেউ জানে না। আপনার লেখা গল্পের মধ্যে দিয়ে এই জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মানুষকে কেন আপনি জানাতে চাইলেন? প্রেরণা কি ছিল?

উর্মিলা ঃ আমি ১৯৭৫ সাল থেকে লিখছি। আসলে আমি যে সম্প্রদায়ের মেয়ে, যেরকম পরিবারে আমি জন্মেছি, তারা কেউ শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানত না। আমার বাবা একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর সময়কালে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েছিলেন এবং একজন শিক্ষক হয়েছিলেন। কিন্তু আমার অল্পবয়সেই তিনি মারা যান। তাই তাঁর কাছ থেকে আমি বিশেষ কিছু শিখতে পারিনি। আর আমার মা তো সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। আমার আশেপাশের মানুষরাও একেবারে নিরক্ষর ছিল। তাই লেখার ব্যাপারটা আমি পূর্ব - পুরুষদের থেকে বা পরিবারের আর কারো কাছ থেকে-যে লিখছে বা যার লেখা আমি শুনেছি-এমন পাইনি। স্কুলে পড়তে পড়তে আমি প্রবন্ধ লিখতাম। ভালো, খুব ভালো, চলনসই, এমন সব মন্তব্য প্রবন্ধগুলোর জন্যে পেতাম। তাই সে সময় আমি মনে করতাম যে আমি ভালো লিখি। সেটা আমার বেশ পছন্দসই ছিল। কিন্তু তারপর আমার বিয়ে হল আর সংসারের দায়িত্ব নিতে হল। বোঝ তো মেয়েদের পক্ষে ব্যাপারটা কেমন হয়, সে নিজের ভেতরের তাগিদটা কেবলই চাপা দিতে থাকে। তার সব আবেগ চাপা পড়ে থাকে। আমারও তাই হল। ধীরে ধীরে ছেলেপুলেরা যখন বড় হল, তখন আবার লেখার তাগিদ অনুভব করলাম। আমার এক বন্ধু ছিল, যার ছেলেপুলে হয়নি। সে সর্বদা কাঁদত। যখনই দেখা হত তার কেবল একটাই বক্তব্য ছিল— তার ছেলেপুলে নেই। তার কষ্ট আমাকে পীড়া দিত। তারপর আমার ভাইয়ের স্ত্রী, আমার বৌদি, তার পাঁচটি মেয়ে, সেও কাঁদত। আমি দেখতুম মেয়েদের সব সমস্যা নিয়ে কিছু করতে পেরেছি তেমন কিছু নয়। কিন্তু যা অনুভব করেছি তা আমার গল্পে লিখেছি।

লতা ঃ তাহলে আপনার অনুভব আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিন।

উর্মিলা ঃ আমার দ্বিতীয় গল্পের নাম 'ন্যায়'। আমাদের গ্রামে এক বিধবা ছিল যে গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। সকলের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল যে বিধবার গর্ভ হয় কি করে? সবাই ঠিক করল যে সভা ডেকে তাকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে। তখন তার চার পাঁচ মাস হয়ে গেছে। কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না।

কার নাম করত? আসলে যে লোকটা দায়ী ছিল তার নাম সে জানত কিন্তু সে তো ওখানে বসে তাকে প্রশ্ন করছিল। সুতরাং সে কিছু বলতে পারল না আর তার শাস্তিও হল। তাকে উপুড় করে গাঁয়ের সব মেয়েরা তার পেছনে দাঁড়িয়ে তাকে লাথি মারতে লাগল। দুটো মেয়ে তাকে ধরে রেখেছিল আর ততক্ষণ লাথি মারা চলল যতক্ষণ না তার রক্তস্রাব আরম্ভ হল। তার ভ্রূণ নষ্ট হয়ে গেল। এই নিষ্ঠুরতার কথা আমার কানে গিয়েছিল। আসলে আমি সেই সময় সেখানে ছিলাম না। তখন আমি এগারো ক্লাসে পড়ি। গ্রামের মেয়েরা এসে আমার মাকে ঘটনাটা বলল। "মেয়েটা বিধবা ছিল তবু এইরকম কাণ্ডটা করল..." এমন ভাবে মাকে বলেছিল যেন একটা মহা বীরত্বের কাজ করে এসেছে। আমি এইসব কথাবার্ত্তা শুনছিলাম। তখনই আমার মনে হয়েছিল লোকে এমন কাজ কি করে করে? নিজের হাতে বিচার নিয়ে নিল আর মেয়েটাকে এমন মারল যে রক্তস্রাব হয়ে গেল। তাই কিছু কাল পরে আমার স্মৃতি থেকে এই ঘটনাটা গল্প হয়ে বেরিয়ে এল। গল্পটা ছিল 'ন্যায়'।

লতা ঃ এরকম গল্প পড়লে মনে হয় দলিত সমাজের যা বহুজন সমাজের অনুভূতি আমাদের সাহিত্যে বিশেষ জায়গা পায়নি। একটা ঘটনা মনে আছে যা আমার ছোটবেলায় ঘটেছিল। আমি একটি দলিত ছেলের হাতে রাখী বেঁধেছিলাম। সমস্ত শহর এই ঘটনার আলোচনা করতে শুরু করেছিল। নাগপুরে আর.এস.এস. পরিচালিত স্কুলে আমি লেখাপড়া করেছি। সেখানে একটি দলিত ছেলের হাতে রাখী বাঁধা অপরাধ মনে করা হত। অনেকেই আমার প্রতি কটাক্ষ করেছিল এবং আমি বুঝেছিলাম যে আমি পিছড়োবর্গের হলেও আমাকে দলিতদের চেয়ে উঁচু বলে গণ্য করা হয়। আর তাই আমার দলিত ভাই থাকা উচিত নয়। আপনার নবম শ্রেণীতে পড়ার সময়কার এই ঘটনা আর আপনার লেখা ওই ঘটনাটি-দলিত মেয়ে যে গর্ভবতী হয়েছিল বলে মার খেয়েছিল- জ্যোতিবা ফুলের ব্রাহ্মণ বিধবাদের নিয়ে কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই বিধবাদেরও নির্মমভাবে গর্ভপাত করানো হত। আপনার লেখায় যে ছবি পাই, আপনার সমসাময়িক লেখকদের লেখাতেও কি সেই ছবি পাওয়া যায়?

উর্মিলা ঃ হ্যাঁ, এখন পাওয়া যাচ্ছে। হরিনারায়ণ আপ্তে এই বিষয় নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেছেন। ক্রমে মারাঠী 'নব কথা' প্রকাশ হল। নতুন গল্পে মানুষের মানসিক অনুভূতি সম্বন্ধে কিছু আদর্শ ছিল। গঙ্গাধর গাডগিল, অরবিন্দ গোখলে, মাডগুলকার, এঁরা ফ্রয়েডের ধারণা নিয়ে লিখেছেন। এই লেখকরা মানুষের মনের সচেতন বৃত্তি সম্বন্ধে লিখতে আরম্ভ করেছেন কিন্তু তাঁদের লেখায় কেবল সমাজের উচ্চশ্রেণীর

সুখদুঃখের কথা পাওয়া যায়। সমাজের পিছিয়ে থাকা শ্রেণীর-দলিতদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা এঁরা করেননি। পরে এঁদের লেখায় এইসব বিষয়বস্তু আসে। কিন্তু সেগুলো আসে করুণার মাধ্যমে— আহা, এইসব দুর্ভাগা লোক, তারা অনগ্রসর, পিছিয়ে থাকা, ওদের অবস্থা নিয়েও আমাদের ভাবা উচিত। কিন্তু যখন ডক্টর আম্বেদকর দলিতদের নেতৃত্ব দিলেন, তখন উনি স্পষ্ট বললেন যে দলিতদের দয়া বা করুণার দরকার নেই। আমরা চাই না তোমরা আমাদের করুণা কর। ভারতের মাটিতে জন্মান একজন ব্যক্তি হিসেবে দলিতরা, তাদের অধিকার দাবী করতে চলেছে। এই যে ন্যায় এবং দাবীর ভাষা, এটা এখনো সাহিত্যে আসেনি। না ছোট গল্পে, না কবিতায়।

আম্বেদকর যখন দলিতদের জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করলেন তখন তিনি 'মুকনায়ক' 'জনতা' আর 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে সাময়িকী প্রকাশ করতে লাগলেন। এই সাময়িকীগুলো দলিতদের ভাষা ব্যবহার করত। যেসব লেখকরা এই সাময়িকীতে লিখতেন তাঁরা দলিতদের অধিকারের কথা লিখতে লাগলেন। আমাদের এই সব অধিকার আছে। আমাদের সেই অধিকার দৃঢ় করা দরকার ইত্যাদি। এই ছাঁচের লেখাটা ক্রমে একটা ধরন (trend) হয়ে গেল। যখন সমগ্র দলিতশ্রেণী এগিয়ে এল তখন তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল কিন্তু তারা আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে ক্রমে সচেতন হয়ে উঠল। "কেবল উচ্চবর্ণেরই অধিকার আছে এমন ভাব কেন? আমরাও মানুষ, আমাদেরও অধিকার আছে।" এই ভাবটা তাদের লেখায় প্রতিফলিত হতে থাকল। দলিত সাহিত্য, দলিতত্ব, তার অনগ্রসরতা, তার কষ্ট আর দুর্দশা নিয়ে সোচ্চার হল। একজন মেয়েরও যন্ত্রণা আছে, কিন্তু তার কষ্টের কারণ হল পুরুষরা। কিন্তু এই লেখকরা এই বিষয় নিয়ে কিছু ভাবেননি। তাঁরা আত্মকাহিনীতে নিজেদের মা বোনেদের নিয়ে লিখেছেন, তাবা কত ভালো, আর বাড়ীর পুরুষদের জন্যে নিজেদের সুখ সুবিধে কত ত্যাগ করেছে, কিভাবে তারা দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করেছে; কিন্তু তাঁরা এ কথা কখনো বলেন না যে তাঁদের স্ত্রীদের কত সহ্য করতে হয়, তাদের কত পরিশ্রম আর লড়াই করে চালাতে হয়। স্ত্রী যা করে তা স্ত্রীর কর্ত্তব্য বলে মনে করা হয় আর তার সম্বন্ধে কিছু লেখা হয় না। আমার অবাক লাগে ভাবতে যে কেন এ নিয়ে কিছু তাঁরা লেখেন না। তুমি হয়তো তোমার স্ত্রীকে মারধোর করেছ। তা সে সম্বন্ধে লেখ না কেন? নিজের জীবন সম্বন্ধে সত্যি কথা বলবে বলে তো লিখতে বসেছ। তাহলে জীবনের কেবল একটা দিক নিয়ে লিখবে এটা তো ন্যায্য হল না। জীবন সম্বন্ধে লিখতে গেলে সব দৃষ্টিকোণ থেকেই লিখতে হয়। নিজের ভুল সম্বন্ধেও লিখতে হয়।

লতা জিজ্ঞেস করেছো আমার গল্পগুলো কি ভাবে আলাদা। আমিই আলাদা রকমের কিনা জানি না, কিন্তু আমি দলিত পুরুষদের সম্বন্ধে ভেবেছি যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অন্যায় করে। দলিত লেখকরা আমাকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন যে আমি কেন তাদের মত লিখি না। কেন আমি আমার সম্প্রদায় সম্বন্ধে লিখি? "আপনার এভাবে লেখা উচিত নয়। আপনি তো উচ্চবর্ণের মানুষদের আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অস্ত্র দিচ্ছেন।" এই বলে অনেক সমালোচক নালিশ করেন। "অস্ত্র বলছেন কেন? আপনারা যখন সেটা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন তখন তা কি ন্যায্য হয়? আমাদের মেয়েদের বিরুদ্ধে আর অস্ত্র চালানো চলবে না।" কখনো তাঁরা একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে আমাকে বক্তৃতা দিতে ডাকেন। যখন তাঁরা আমার গল্প সম্বন্ধে জানতে চান তখন উল্টে আমি জিজ্ঞেস করি, "আপনার স্ত্রী কই? তাঁকে আনুন তাহলে আমিও আসব।" আমার স্বামীও তাদের জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কেন আমার স্ত্রীকে ডাকতে এসেছেন? আপনার স্ত্রী কোথায়? আপনাকে আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে আনতে হবে।" এই সব লোকেরা চান যে তাঁর স্ত্রীরা বাড়ীতে থাকুক। তাঁদরে জন্যে রান্না করুক, ছেলেপুলের দেখাশুনো করুক, আর সবকিছু সামলাক। তাঁরা সারা শহরে টহল দিয়ে বেড়াবেন, কাজে যাবেন, বাড়ী আসবেন আর খাবেন আরাম করবেন আর অন্য মহিলাদের মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিতে বলবেন।

লতা ঃ সম্প্রতি নাগপুরে দলিত মহিলাদের একটা সমাবেশ হয়েছিল। একটা প্যামফ্লেট বার করা হয়েছিল সেটা কিন্তু আসলে দলিত মহিলারা বার করেননি। দলিত পুরুষরা বার করেছিলেন। তাতে ছিল যে মার্ক্স, লেনিন, আম্বেদকর, সবাই তাঁদের স্ত্রীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই নিজেদের গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। এই দলিত পুরুষরা চাইছিলেন যে দলিত মহিলারাও তাঁদের ত্যাগের মাধ্যমে পুরুষদের অবিস্মরণীয় করে তুলুন। দলিত পুরুষরা মানেন না যে দলিতত্ব যেমন তাদের পরিচিতি হয়ে গেছে তেমনই সেটা একইভাবে দলিত মেয়েদেরও পরিচিতি হওয়া উচিত। (দলিত নারীদের) ব্যক্তি-পরিচয় কি? নিশ্চিত ভাবেই জাতিভেদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা তাদের ব্যক্তিপরিচয়ের একটা অংশ। কিন্তু পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটা যেন দলিত পুরুষদের সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা বলে গণ্য হয়। এটা যেন আয়নার সামনে দাঁড়ানো। উর্মিলার আরো একটি বই আছে...সুন্দর মারাঠীতে লেখা, মারাঠী সাহিত্যের প্রবহমানতার কথা নিয়ে "আমরাও ইতিহাস গড়েছি"...উর্মিলা আর মীনাতাই দলিত নারীদের অবদানকে স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন। যখন আপনারা এই কাজটা আরম্ভ করলেন, তখন দলিত নারীরা কিভাবে সাড়া দিয়েছিল? দলিত

পুরুষদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? দুই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তফাৎ ছিল কি?

উর্মিলা ঃ তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব আগে দিই, তোমাকে দয়া পাওয়ারের লেখা 'বালুত' (বেতনহীন চাকর) থেকে উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা সবাই 'বালুত' সম্বন্ধে জানি। সালমা বলে একটি মেয়ে পাশের বাড়ী থাকত। তার সঙ্গে ওর প্রেমপর্ব চলছিল। কিন্তু সেই সময় তার সাই নামে বিবাহিত স্ত্রী ছিল। সে আবার একটি মুসলমান ছেলের প্রতি আকৃষ্ট ছিল আর সে (দয়া পাওয়ার) ব্যাপারটা পছন্দ করেনি। ও স্ত্রীকে ত্যাগ করল। সে সময় স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। পরে সে একটি মেয়ের জন্ম দেয় আর দয়া দুজনকেই বাড়ী থেকে বার করে দেয়। তারপর দয়া নাজমা নামে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে থাকছিল। এই ব্যাপারটা নিয়ে ও লিখেছি। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে যে, তোমার স্ত্রী যা করছে তা তুমি সইতে পারলে না, কিন্তু তুমি ঠিক একই কাজ করলে। সুতরাং তুমি বল এক কথা আর কর আরেক কাজ। এটা কি করে হয়? তুমি যা কর তা অন্যায়? আমি দয়াকে এ কথা বলেছি আর এ নিয়ে গরম গরম অনেক বাদপ্রতিবাদ হয়েছে। আমি যে বইটা লিখেছি — 'আমরাও ইতিহাস গড়েছি' আমি তাতে লিখেছি যে বাবাসাহেব আম্বেদকর দলিত আন্দোলন আরম্ভ করলেন এবং ঠিক যেমন পুরুষরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তেমনি মেয়েরাও। মাহারে জল নিয়ে যে লড়াই হয়েছিল সেটা এর একটা উদাহরণ। এই সমাজে জলেরও ভাগবাটরা হয়। এটা ব্রাহ্মণের জল, এটা মারাঠাদের, এটা নীচু জাতের। কেউ আবার জলই পায় না। জল আনার জন্যে মাথায় পাত্র নিয়ে তাদের দশ মাইল হাঁটতে হয়। জলের যেমন ভাগ করা হয়েছে তেমনি দেবতারও। "এই মন্দিরটা ব্রাহ্মণদের, এখানে খালি ব্রাহ্মণরা পুজো করতে পারে, দলিতরা ওখানে ঢুকতে পারে না — এই ধরণের অন্যায় বিচার সমাজে চলত। ডক্টর আম্বেদকর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন চালিয়েছিলেন। মেয়েরাও এই আন্দোলনে ভাগ নিয়েছিল। এম এ পাশ করার পর আমি ভেবেছিলাম যারা আম্বেদকরের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তাদের ওপরে পি.এইচ.ডি করব। তাই বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। সেখানে আমাকে জানানো হল যে যেহেতু আমি মারাঠীতে এম, এ করেছি তাই আমি যা করতে চাই তা করতে হলে আমাকে সমাজবিজ্ঞানে আরেকটা এম, এ করতে হবে। তবেই আমি যা করতে চাই তা করতে পারব কারণ আমার কাজ হবে ওই আন্দোলন নিয়ে। যখন আমি ছায়া দাতারকে জিজ্ঞেস করলাম তখন সে বলল, পি.এইচ.ডি করার দরকারই বা কি? গবেষণা করে তো আমি বই লিখতে পারি। তখন আমি জানতাম না যে এস.এন.ডি.টি. বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি যা করতে চেয়েছিলাম তা করা যেত। সত্যি বলতে কি ওই বইটার জন্যে আমি ডক্টরেট পেতে পারতাম।

আমি আমার বন্ধু মীনাক্ষী মুনের সঙ্গে একত্র হলাম। আমরা যখন গবেষণা আরম্ভ করলাম তখন লোকে আমাদের ব্যঙ্গ করত। তারা বলত, "কোনো মেয়ে আম্বেদকরের আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তুমি কি খুঁজে বেড়াচ্ছ?" আমি উত্তর দিতুম, "সে আবার কি? শান্তাবাঈ দানি ছিলেন, দাদাসাহেব গায়েকোয়াড়ের স্ত্রী গীতাবাঈ গায়েকোয়াড় ছিলেন।" ওরা দেখিয়ে দিত যে চার পাঁচজনের বেশী মহিলা ছিল না। তা সত্ত্বেও আমার মনে হত যে আমাদের গবেষণা চালিয়ে যাওয়া উচিত। আমরা তখন নাগপুর যাওয়ার কথা ভাবলুম। আসলে কোংকন বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মস্থান। তিনি বুঝেছিলেন কোংকন একটা অনগ্রসর জায়গা। সেখানকার দলিতদের না আছে শিক্ষা না আছে টাকা পয়সা — খুবই গরীব। আর একটা আন্দোলন চালাতে গেলে টাকার দরকার হয়। তিনি তাই নাগপুরকেই তাঁর কাজের কেন্দ্র করেছিলেন আর সেখান থেকেই তাঁর আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ফল হয়েছে এই যে নাগপুরের মেয়েরা অনেক বেশীভাবে আন্দোলনে যোগ দিতে পেরেছিল। তাই আমি মীনাক্ষীর সঙ্গে নাগপুরে গেলাম। মীনাক্ষী নাগপুরেরই মেয়ে। আমরা যখন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তখন কেউ বলত "একজন মহিলা আছেন তিনি অনেক কাজ করেছেন। তাঁর সঙ্গে কেন কথা বলনা?" কিন্তু আমরা তাঁর কাছে গেলে তাঁর প্রতিক্রিয়া হত, "কে?" "কোন আম্বেদকর?" কেউ অন্য কোনো মহিলার কাছে পাঠাত, বলত "তার কাছে দলিল দস্তাবেজও পাবে।" তাই যাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম তাদের আমরা প্রশ্ন করতাম। এখন মেয়েরা সাহসী হয়েছে। তারা সত্যি কথা বলতে পারে মিথ্যে বলতে বাধ্য হয় না। কিন্তু আগে মেয়েদের বেঁচে থাকার জন্যে মিথ্যে বলতেই হতো। যখন ইচ্ছে হত তখন স্বামীরা মেয়েদের গুণ গাইত, কিন্তু যখন তারা স্ত্রীদের মারত তখন মারের দাগ দেখা গেলেও,— মেয়েরা মার খাওয়ার কথা অস্বীকার করত আর সহ্য-করত। তখনকার দিনে ওইরকম হত। এই মেয়েরাই আবার স্বামীর প্রশংসা করত।

"হ্যাঁ, ও তো আমাকে আন্দোলনে যোগ দিতে বলেছিল। ও চাইত যেন আমি সভা সমিতিতে যাই," এই সব মহিলারা বলত।

"কিন্তু তুমি গেলে রান্নাবান্না কে করত?"

"আমিই রান্না করতাম।"

"ছেলেপুলের দেখাশুনো কে করত?"

"আমি দেখাশুনো করতাম।"

"তাহলে ক্ষেতের চাষবাস কে দেখাশুনো করত?"

"সেটাও আমিই করতাম।"

"তাহলে আন্দোলনে কাজ করার সময় কখন পেতে?"

শেষ পর্য্যন্ত তারা বলত, "হ্যাঁ আমরা সভায় যেতে পারতাম না, আমার স্বামী বলত, আমিই যাই সভায়, তোমাকে পরে সে সম্বন্ধে বলবোখন।"

এইভাবে আমরা আন্দোলনে যোগ দেবার সীমা বুঝতে পারতাম। কিছু মেয়ে অবশ্য আমাদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলেছিল আর তারা খুব স্পষ্টভাষী ছিল। একজন বলল, "আমার স্বামী আমাকে খুব মারধোর করত। যখন আন্দোলনের কর্মীরা এসে আমাকে ডাকত তখন ও বলত, "তোমার পতিরা এসেছে, যাও তাদের সঙ্গে ফূর্তি কর গিয়ে।" দলের কর্মীরা ওকে ধরে মেরেওছে। ডক্টর আম্বেদকর তাঁর লেখায় আর কিছু বক্তৃতায় পুরুষদের উৎসাহ দিতেন যেন তারা তাদের স্ত্রী মা এবং বোনেদের সভায় নিয়ে আসে যাতে এই আন্দোলন তাদের কাছে পৌঁছে যায়। যখনই আম্বেদকর কোনো সভা করতেন, তখন মেয়েরা রাঁধত, আর তিনি বলতেন, "রান্না করতে এত সময় নষ্ট কোর না।" মেয়েরা যদি তাঁর জন্যে মিষ্টী করে আনত তবে তিনি বলতেন, "আগে সকলকে সঙ্গে নিয়ে আস কিন্তু তারা ওঁর কথা শুনত না।"

নাগপুরে কিছু মেয়ে ব্যায়ামের কাজ শেখাত। আমরা তাদের দু'একজনকে দেখেছি। তাদের বাবারা ব্যায়াম শিক্ষক ছিল যারা মালখামের খেলা দেখান। এই মেয়েরা আখড়ায় শিখেছে। একজনের নাম ছিল চন্দ্রিকা রামটেকে আর অন্যজন শান্তাবাঈ বলরাম। তাদের গায়ে এত জোর ছিল যে ওরা যখন আমাদের হাত ধরত (এত জোরে ধরত) তখন আমরা ছাড়াতে পারতাম না। যখন নাগপুরে এই আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়েছিল তখন তারা বলেছিল যে তারা হিন্দু-মুসলমান দুদলকেই সমর্থন করে। এই আন্দোলনের এটা একটা ভালো দিক যে, মেয়েরা যারা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তারা নিজেদের সমাজের অংশ বলে ভাবতে শিখেছিল। যে মেয়েরা বাড়ীতে থাকত তাদের সঙ্গে এদের তুলনা করে দেখ, যারা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তারা অনেক বেশী সচেতন ছিল।

লতা ঃ নারীভিত্তিক সমস্যা আর নারীভিত্তিক শিক্ষার দিকে এখন অনেক মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় এটা প্রায় উত্তেজক পর্য্যায়ে গিয়ে পড়ে। মীনাক্ষী তাইয়ের বই, যেটা বের হয়েছে, সেটা কিন্তু মেয়েদের জীবনের এমন দিক তুলে ধরেছে যা এতদিন চোখের আড়ালে ছিল আর সেটা উত্তেজনাসর্বস্ব নয়। তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন গ্রামেগঞ্জে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে। তার ফল হল এই ইতিহাস। নারীবাদী ইতিহাস পড়ার সময় আমি বুঝেছি

উর্মিলার এবং অন্য মহিলাদের লেখা প্রাদেশিক স্তরে কত প্রয়োজনীয়। যেমন তারা ভবালকার আর অন্যান্য মহিলারা এই ধরণের কাজ করছেন। তাঁদের লেখা নারীভিত্তিক শিক্ষার অন্তর্গত করা উচিত। আমি তো মনে করি, উর্মিলা যে বলছেন, যে, তাঁর কিই বা সাহিত্যে অবদান, এটা তাঁর বিনয়। উর্মিলা হলেন সেই লেখিকাদের একজন যাঁদের লেখা নারীভিত্তিক শিক্ষার মূলস্রোতের অন্তর্গত করা হয়নি।

আমি নিজে এই আন্দোলনের একজন শরীক, আমি এই মহিলাদের দেখেছি- নলিনীতাই (সোমকুয়ার) শান্তাবাঈ, সুগন্ধাতাই শেণ্ডে, কুমুদতাই পাওড়ে। এই সব মহিলারা প্রেরণাদাত্রী, উৎসাহী আর তাঁদের মধ্যে বিদ্রোহের শক্তি আছে। অথচ আমরা যখন কোন নারীবাদী সমাবেশে যাই তখন আমরা নিজেদের বিদ্রোহী নারীবাদী বলি। আমি মনে করি যে বিদ্রোহী নারীদের ধারা উর্মিলাতাইর বই থেকে এসেছে কারণ তাঁকে তো লড়াই করতে হয়েছিল। যেমন উর্মিলাতাই আশীবছর বয়স্কা বিমলাতাই বাগালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি স্মৃতিচারণ করে বললেন যে যখন বাবাসাহেব আম্বেদকর হিন্দু কোড বিল লোকসভায় পেশ করেছিলেন, তখন খুব হ্যাঙ্গামা হয়েছিল। কারণ বিলটি যেমন ভাবে পেশ হয়েছিল তেমনভাবে পাশ হয়ে গেলে হিন্দুদের এবং অন্যান্য পুরুষদের (মেয়েদের প্রতি এবং অন্যান্যদের প্রতি তাদের যে আচরণ) বড়ই অসুবিধে হত। বাবাসাহেবকে তাই হিন্দু কোড বিল নিয়ে নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, এমনকি রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছ থেকেও অনেক বিরোধীতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আম্বেদকর রাজনীতি থেকে এই কারণে পদত্যাগ করেছিলেন। পদত্যাগের পর তিনি কোলহাপুরে গিয়েছিলেন। তিনি একটা বিশ্রামগৃহে ছিলেন আর বলেছিলেন যে কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। সেই সময় বিমলাতাই বাগাল ও সর্বভারতীয় মহিলা সংগঠন থেকে আরো কিছু মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁরা সবাই দলিত এবং নীচু সম্প্রদায়ের মহিলা। তাঁদের মনে আছে বাবাসাহেব বলেছিলেন নেহেরু ও প্যাটেল তাঁকে লিখে জানিয়েছেন যে বহু মেয়ে এই বিলের বিরুদ্ধে। তারা বলেছে যে এই বিলের বিরুদ্ধে। তারা বলেছে যে এই বিল পাশ হওয়া যেন আটকানো হয়। হিন্দু মেয়েরা সই যোগাড় করার একটা অভিযানও চালাচ্ছিল যাতে প্রমাণ হয় যে তারা এর বিরুদ্ধে। এই মহিলারা (যাঁরা বাবাসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন) তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে ওই হিন্দু মেয়েরা তিন শতাংশ হলেও তাঁদেরই বক্তব্য শোনা হয়। "আমরা সাতানব্বুই শতাংশ মেয়েদের হয়ে বলেছি যে, আপনার পদত্যাগে আমরা বিচলিত। আপনি যদি পদত্যাগ না করে এই বিলটি পাশ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেন তাহলে আমরা আমাদের অধিকার পাই।" বিমলাতাই যখন এ কথা বললেন,

তখন বুঝলুম আমাদের ইতিহাস কতখানি আড়ালে রয়ে গেছে। বি আর আম্বেদকর আবার চেষ্টা করলেন হিন্দু কোড বিল পাশ করাতে, যা একটা অসাধারণ অবদান আর যার জন্যে উচ্চশ্রেণীর মেয়েরাও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাই আমি মনে করি যে উর্মিলার লেখা বা শান্তাবাঈয়ের উপস্থিতি বা বেবীতাই কাম্বলের লেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। উর্মিলা তাঁর আত্মজীবনীর ওপর কাজ করেছেন, যা মূল্যবান সব অভিজ্ঞতায় ভরপূর হবে কারণ তিনি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আপনি যদি আপনার অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেন তবে বড় ভালো হয়।

উর্মিলা ঃ দয়া পাওয়ারের 'বালুত' দলিত সাহিত্যে আত্মজীবনী লেখার ধারা প্রচলন করল। এরপর এল লক্ষ্মণ মানের 'উপরা' (অন্যজন) তারপর লক্ষ্মণ গায়কোয়াড়ের 'উছলিয়া' (অপচয়ী) আরো অনেক লোক এই ধারায় লিখতে লাগলেন। মুম্বাইতে একটা সম্মেলন হয়েছিল মুম্বাই মারাঠী গ্রন্থ সংগ্রহালয়ের ব্যবস্থাপনায়। সভানেত্রী ছিলেন সরোজিনী বৈদ্য। আর আজকের কাগজে আমি পড়লুম যে তিনি দলিত লেখকদের আর দলিত সাহিত্যকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতানুযায়ী এরা কেবল জাতিবাদ নিয়ে লিখেছে আর বর্ণ অনুসারে ভাগ করে সাহিত্যকে সীমিত করে দিচ্ছে। তিনি দাবী করছেন যে এ ধরনের সাহিত্য একটি বিশেষ বর্ণের সাহিত্য বলেই গণ্য হতে পারে ইত্যাদি। সাহিত্য এভাবে উন্নতি করতে পারে না। সাহিত্যেরও বর্ণভেদ হতে আরম্ভ হবে আর এটা শুভ নয়, এই তাঁর মত। আমি এসবের সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি ভারতীয় সমাজ অনেক জাতে বিভক্ত। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি যে মাহার জাতি পঞ্চাশটি উপজাতে বিভক্ত। তাই প্রত্যেকটা জাতের পঞ্চাশটা উপজাত থাকতে পারে, এমনিভাবে-হাজারটা।

প্রত্যেক জাতের নিজস্ব সংস্কৃতি, খাওয়ার আর থাকার ধরণ আছে। প্রত্যেক সংস্কৃতির নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে, আবার এই সব অভিজ্ঞতা সমাজের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং এমনি হতে দাও। সাহিত্যেও বর্ণভেদ থাকুক, এভাবে সেটাকে বাধা দেওয়া যায় না। হয়তো পরে এটাকে সমালোচনা করা যেতে পারে কিন্তু লেখা আরম্ভ হবার আগেই এমন লেখা চলবে না—এটা বলা ঠিক নয়। এই ধরণের যুক্তি অনুযায়ী বলতে হয়, যেহেতু দলিত পুরুষরা কিছু প্রশ্ন ইতিমধ্যেই তুলে ধরেছে তাই দলিত মেয়েদের লেখার আর প্রয়োজন কি? তারা কি আর লিখবে? এভাবে তর্ক ওঠান যায় না। মেয়েদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম হয়। মেয়েরা সত্যিই দলিত সাহিত্যকে অনেক দিয়েছে। বেবীতাই কাম্বলে লিখেছেন 'জীনা আমুঞ্চ' (আমরা যে ভাবে বাঁচি) শান্তাবাঈ কাম্বলে লিখেছেন 'মাঝা জন্মাচি চিত্রকথা' (আমার জীবনের কাহিনী)

যাতে তিনি তাঁর কষ্টের কথা লিখেছেন। কুমুদ পাওড়ে লিখেছেন 'অন্তঃস্ফোট'। নামদেব ধাসালের স্ত্রী মল্লিকা অমরশেখ দলিত পুরুষদের বর্ণান্তরে বিয়ের অভিজ্ঞতার কথা তাঁর 'মালা উদ্বাস্তা ভায়চয়া' (আমি ধ্বংস হয়ে যেতে চাই) বইতে লিখেছেন এবং 'মিঠলি কবাড়ে'র (বন্ধ দরজা) লেখিকা হলেন মুক্তা সাবভাগোদ। এই চাঁরপাঁচটি আত্মজীবনী মূলক লেখা প্রকাশিত হয়েছে আর সেগুলি পিতৃতন্ত্রের এবং পুরুষ শাসিত সমাজের একটা ছবি তুলে ধরে।

বেবীতাই কাম্বলে তাঁর আত্মজীবনীতে খুব ভালো সমাজ এবং মহিলাদের সম্বন্ধে লিখেছেন। তিনি কৌতুক করে নীচু সম্প্রদায়ের মেয়েদের আর তাদের কুসংস্কারের কথা লিখেছেন। তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন কেন? আগেকার দিনে মেয়েদের খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যেত আর শাশুড়ী বৌয়ের সম্পর্ক সাপ নেউলের মতন হত। শাশুড়ী বৌমাকে জ্বালিয়ে মারত আর শেষ অবধি স্বামী স্ত্রীকে অপছন্দ করতে শুরু করতো। তখনকার দিনে শাশুড়ী করত কি বৌকে চারটেয় উঠিয়ে দিত। ওঠবার পর তাকে বলত গম পেষো আর জল তোল। যখন বৌ গম পিষছে তখন বৌকে কোনো কাজে (কিছুক্ষণের জন্যে) সরিয়ে দিয়ে শাশুড়ী এক টুকরো চুড়ি আটার মধ্যে রেখে দিত আর বৌকে বলত ওই আটা দিয়ে রুটি গড়তে। বেচারা বৌ তাই করত। রুটি হবার পর শাশুড়ী কয়েকটা তুলে নিয়ে খেত। যখন দাঁতে লাগত- ও তো জানত কারণ নিজেই কাঁচ মিশিয়ে দিয়েছিল- তক্ষুনি শাশুড়ী বলত, "আরে বাপরে, দেখ বৌ কি করেছে। কাঁচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছে আমাদের মারবার জন্যে, দেখ।" শাশুড়ী সবাইকে ডেকে ডেকে বলত। তখন প্রতিবেশিনীরা বলত "এ তোমার বৌ না শত্রু? বের করে দাও ওকে।" তারপর ছেলেকে ডেকে বলত "দেখ, তোমার বৌ কি করেছে। সবাইকে মেরে ফেলার জন্যে কাঁচের গুঁড়ো খাওয়াতে গিয়েছিল।" তখন ছেলে স্ত্রীকে মারত আর এমন জ্বালাত যে স্ত্রী চেষ্টা করত বাপের বাড়ী পালিয়ে যেতে। কিন্তু ওর পায়ে কাঠের পাট্টা বেঁধে দিত যাতে পালাতে না পারে। সেই কাঠের পাট্টা টেনে টেনে তাকে চলতে হত, না পারত দৌড়োতে না পারত তাড়াতাড়ি চলতে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা এমন মারত তাকে আর এত খারাপ ব্যবহার করত যে গোড়ালীতে বাঁধা পাট্টা সত্ত্বেও কিছু মেয়ে বাপের বাড়ী পালিয়ে যেত। সে বাপের বাড়ী যেত আর তারা আবার মেরে ধরে স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যেত।

যাদের ওপর অত্যাচার হত, তারা ভাবত যে ভগবান তাদের সহায় আছেন। তাই যদি তাদের ওপর দেবদেবীর ভর হয় তবে তারা ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে

পারবে, সবাই তাদের পায়ে পড়বে। তাই প্রত্যেক মঙ্গলবার হোক বা শুক্রবার হোক কোনো একদিন দেবীর ভর হবে ঠিক করত। সে জানত যে আসলে দেবদেবীর এর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। তবু ভাণ করত যেন তার ওপর ভর হয়েছে। ওরা স্বামী বা শ্বশুরকে বলত "এই বোকা, মুখ্যু কোথাকার, দেখছিস কি? দেবীকে এসে ভেট চড়া।" তক্ষুনি তক্ষুনি জিনিষপত্রের ভেট চাইত। কিন্তু ঠিক মত ভেবেচিন্তে না করায় শাড়ী গয়না চাইত না। তার বদলে বলত, "আমাকে কুমকুম দে, চুড়ি দে।" স্বামী শুনত, কারণ স্ত্রীর ওপরে নাকি দেবীর ভর হয়েছে। দেবী তখনই তার শরীর ছেড়ে যেত যখন মেয়েটি ভর হওয়ার অভিনয় করা বন্ধ করত। তারপর মেয়েটি নিজেই তার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করত, কি হয়েছিল—"আমি কি করেছিলুম?" তারা বলত "তুমি অনেক কান্ড করেছ, তোমার স্বামী, তোমার শাশুড়ী, তোমার শ্বশুর সবাই কেঁদে তোমার পায়ে পড়েছিল।" সবাই তার পায়ে পড়ছে তার কথা শুনছে এ ব্যাপারটা মেয়েটির খুব ভালো লাগত। সুতরাং এই সুখটা পাবার জন্যে মেয়েটি কুসংস্কারের সাহায্য নিত। কুসংস্কারের সাহায্যে সে নিজের পরিচয়টা বদলাতে চাইত।

বেবীতাই কাম্বলে এদের জীবন সম্বন্ধে ভালো করে লিখেছেন। মেয়েরা ঠিকমত খাবার পেত না, কাপড়ও না। সবাই নোংরা থাকত। কেমন করে স্নান করত? কেমন করে উকুন বাছত? বেবীতাই এ সম্বন্ধে লিখেছেন। এতদিনে হয়তো ইংরিজীতে তার অনুবাদও হয়ে গেছে। শান্তাবাঈ কাম্বলে লিখেছেন, কেমন করে তাঁর স্বামী তাঁকে মারত, কি ভাবে সে দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে এসে তাঁর বাড়ীতে জোর করে থাকতে চেয়েছিল। বেবীতাই কাম্বলে আমাদের বলেছেন যে বেশীরভাগ মেয়েরা ছোটবেলার স্মৃতি নিয়ে লিখেছে। শুধু শান্তাবাঈয়ের বইয়ে তাঁর স্বামী তাঁর সঙ্গে কি রকম দুর্ব্যবহার করত তার বর্ণনা পাওয়া যায়। অন্যরাও আন্দোলন সম্বন্ধে লিখেছে। বেবীতাই কাম্বলে তাঁর নিজের এক অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন। তিনি তখন পুণায় থাকতেন, তাঁর স্বামীর চাকরি ছিল না। বেবীতাইয়ের বোন মুম্বাইতে থাকতেন। তিনি স্বামীকে বলেছিলেন, "চলো, আমরা মুম্বাই গিয়ে কাজের খোঁজ করি।" দুজনে আসছিলেন বাসে করে। বেবীতাই কাম্বলে (শাড়ী দিয়ে) তাঁর মুখ ঢেকে বসেছিলেন। কিছু কলেজের ছাত্ররা তাঁর সামনে বসেছিল আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল আর কথাবার্ত্তা বলছিল। লোনাভালায় পৌঁছে তারা বাস থেকে নেমে গেল। তাঁর স্বামীও নেমে গেল আর একটা বড় পাথর হাতে নিয়ে এল সেটা সে বেবীতাইকে ছুঁড়ে মারল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কেন ও এমন করল। তাঁর তখন মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছিল। সে বলল তাঁর আশেপাশের লোকেরা

হাসছিল, তাই সে তাঁকে মেরেছে। বেবীতাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন ক্ষতটাও ফুলে উঠেছিল। মুম্বাই পৌঁছে এই অবস্থায় তিনি বাস থেকে নামলেন আর বোনের বাড়ী পৌঁছলেন। বোন তো তাঁকে দেখে অবাক। ভগ্নীপতি বলল, "তোমরা এখানে থাকতে পারবে না, এখানে কোনো কাজ নেই। এই টাকা নিয়ে পুণায় ফিরে যাও।" এই বলে দশটা টাকা বেবীতাই কাম্বলের হাতে দিয়েছিল। ওঁরা বেরিয়ে এলেন আর তাঁর স্বামী চটি খুলে ওঁকে মারতে শুরু করল। "মারছ কেন", তিনি জিজ্ঞেস করলেন। উত্তর হল, "তোমার জামাইবাবু তোমায় দশ টাকা দিল কেন?" দেখ, কি রকম সামান্য কারণে এরা তাদের স্ত্রীকে মারধোর করত। এই নৃশাসতা তাঁদের আত্মজীবনীতে প্রকাশ পাওয়া উচিত।

লতা ঃ নিম্নবর্ণের মেয়েদের সম্বন্ধে নারীবাদীদের একটা ধারণা প্রচলিত আছে। আমি যখন নারীকেন্দ্র নিয়ে একটা ক্লাস আরম্ভ করলাম তখন উচ্চবর্ণের এবং উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়েরা এসে বলত, "আমাদের পক্ষে বাড়ী থেকে বেরোন খুব মুশকিলের ব্যাপার। যারা গরীবঘরের নীচু সম্প্রদায়ের মেয়ে তাদের বরং অনেক সুবিধে, তারা স্পষ্ট কথা বলতে পারে। তাদের ঝগড়া খোলা রাস্তায় হয়। তাদের পক্ষে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া খুব সোজা," কিন্তু উর্মিলার অভিজ্ঞতা, বেবীতাইয়ের অভিজ্ঞতা বা শান্তাবাঈ কাম্বলের অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে যে দলিত মেয়েদের পক্ষেও বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা উঁচুজাতের মেয়েদের বেরিয়ে যাওয়ার মতনই শক্ত। এদের যদি পায়ে কাঠের পাট্টা বেঁধে বাঁচতে হয় তবে অনেকটাই সহ্য করতে হয়। সুতরাং এটা ভুল ধারণা যে দলিত মেয়েরা ইচ্ছে করলেই অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে পারে। অথবা তারা চট করে বিবাহবিচ্ছেদ পেতে পারে কিংবা বাড়ী থেকে পালিয়ে যেতে পারে। সে স্বাধীনতাও নেই, সেই ইচ্ছেশক্তিও নেই। উর্মিলা যা বললেন, আমার মনে হয় যে নারীবাদী সাহিত্য আর নারীবাদকে উচ্চবর্ণের দৃষ্টিকোণ থেকে সরে আসতে হবে। উর্মিলার এই ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে আমি তাঁকে তাঁর আম বিক্রেতা মেয়েদের নিয়ে লেখা গল্প 'বর্ম' (কবচ) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে চাই। দলিত পুরুষদের কাছ থেকে কেমন প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলেন? গল্পটাকে তো অশ্লীল আর অশালীন বলে বর্ণনা করা হয়েছিল...আপনার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

উর্মিলা ঃ গল্পটার ব্যাপারে — দলিত গোষ্ঠীর মধ্যে গালাগাল দেওয়াটা নতুন কিছু নয়। দিন আরম্ভ হয় আর শেষ হয় গালাগালের মধ্যে দিয়ে। ওরা গালিগালাজ করে আর সেটাই এক ধরনের ভাষা হয়ে গেছে। আমার গল্পের অশালীন কথাগুলো ওদের খুব পরিচিত। এই কথাগুলো ব্যবহার করা কিছু খারাপ নয়। তোমরা সবাই

নামদেব ধাসালের ব্যাপার জানো। অনেক খারাপ কথা ওর লেখায় আছে। এসব তো দলিত সাহিত্যের ভাষা বলে ধরা হয়। কিন্তু আমি পুরুষদের দেখেছি — দেখেছি পুরুষরা কি চোখে মেয়েদের দেখে। ওরা বোঝে না যে ওরা খুব সহজে যে সব খারাপ কথা বলে সেগুলো আসলে মেয়েদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়। তোমরা সবাই সে কথাগুলো জানো। সে কথাগুলো খুব চলতি। তাই আমার ওপর ওদের আক্রমণটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। কেউ বলল না যে আমি ঠিক লিখেছি। উল্টে দলিতগোষ্ঠীর লেখকরা বলল, "লেখো তুমি, কিন্তু লেখো কি ভাবে উচ্চবর্ণের মানুষরা আমাদের অপমান করে। আমাদের পুরুষদের দোষ দেখিয়ে লেখাটা ঠিক নয়।"

লতা ঃ আপনি কি নারীবাদীদের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছিলেন?

উর্মিলা ঃ নারীবাদীদের কাছ থেকে আমি খুব সমর্থন পেয়েছি।

লতা ঃ কি ভাবে সমর্থন পেয়েছেন? আপনার গল্প অশালীন, অশ্লীল বলে যে মৌলবাদীরা আক্রমণ করেছিল, তার থেকে রেহাই পেলেন কি করে? লড়াইটা কি ভাবে হল?

উর্মিলা ঃ ব্যাপারটা এমন হল যে এটা আমার পক্ষে কোনো লড়াই হয়ে ওঠেনি। উল্টে আমি বিখ্যাত হয়ে গেলাম। খবরের কাগজগুলো গল্পটার উল্লেখ করে লিখত, "পড়ে দেখ এটা কোনো ভালো গল্প নয়, কিন্তু পড়ে বোঝ কেন এটা ভালো নয়।" এখন তো একটা রীতি চালু হয়ে গেছে যে যদি নজরে পড়তে চাও তবে অন্যরকম কিছু কর। এই ভাবে আমি নজরে পড়ে গেলাম। একপাশে পড়ে ছিলাম, একটু বেরিয়ে এলাম।

লতা ঃ এই যে ভাষার অপভ্রংশ সাহিত্যে আসছে, বিশেষতঃ দলিত সাহিত্যে আর নীচু সম্প্রদায়ের লেখকদের লেখায়, আপনার কি মনে হয় এ সব মারাঠী সাহিত্যকে ঐশ্বর্য্যশালী করছে, নাকি সীমিত করছে? আপনার অভিজ্ঞতার কথা আমাকে আরেকটু বলুন।

উর্মিলা ঃ যে কোনো ভাষাই সুন্দর, কেননা সেটা মানুষের মনকে প্রকাশ করে। ভাষা তো সমাজ জীবনের একটা প্রধান অংশ। সব কথ্য ভাষাই সাহিত্যের অঙ্গ হওয়া উচিত। ছকে ফেলা ভাষাই যে সাহিত্যের গ্রহণীয় ভাষা হবে তা নয়। সমাজ তো ভাষায় আর জাতে বিভক্ত হয়ে আছে আর সমাজের প্রতিটি অংশেরই আলাদা অভিজ্ঞতা আছে। তা স্বাগত করাই উচিত।

বৈষম্য আর সংরক্ষণ

লতা ঃ জাতের ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের অত্যাচার দেখতে পাওয়া যায়। আমার স্বামী রবীন্দ্র আর. পি. নিজে একজন নারীবাদী—সবাই তাঁর কথা জানে কারণ তিনি এখানেই পড়ান, এস.এন.ডি.টি.-তে। আমার জাত হল বাড়াই (বারই) অর্থাৎ যারা পান চাষ করে। ওই যে পান যা আমরা খাই, বাংলা, কাণপুরি ইত্যাদি। যারা এই পানের চাষ করে তাদের বাড়াই বলে। মুম্বাইতে এই জাত সম্বন্ধে কেউ, খবর রাখে না। এই কাজটাই তো মুম্বাইতে নেই। পানের চাষ নদী বা পুকুরের ধারে হয়। যেহেতু আমি ও জাতের মেয়ে তাই আমার শাশুড়ী যিনি জন্মে এই জাতের নাম শোনেননি, আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করতেন যা অচ্ছুৎদের সঙ্গে ও লোকে করে না। আমার এসব বলতে এখন কোনো বাধা নেই। অনেক সময় পার করে তিনি এখন মেনে নিয়েছেন যে এটা ভুল হয়েছিল। কিন্তু কুড়ি বছর লাগল এটা মানতে আর আমাকে অতদিন সেই অবস্থার মধ্যে কাটাতে হল। আমার থালা আলাদা রাখা হত, আমাকে ঠিকমত খাবার দেওয়া হত না। আমার ননদ ভি.জে.টি.আই-তে ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের অধ্যাপিকা। তা সত্ত্বেও বাড়ীর আবহাওয়া এই রকম ছিল। তাই এটা বলা ঠিক নয় যে মুম্বাইতে কিংবা উচ্চশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এমন অভিজ্ঞতা হয় না। সত্যি বলতে কি আমি তখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলাম। রবি তার কারণ বুঝেছিল আর নিজের বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছিল। তাই আজ আমি ডিভোর্স করা মহিলা নই। যদি রবি তাদের কথা শুনত তবে আজ আমি মেয়েকে নিয়ে আলাদা থাকতাম। দলিত পুরুষরাও ভাবে আমার ব্রাহ্মণ স্ত্রী চাই কিন্তু সে আমার পদবী ধরাণ করবে। ওরা এই রকম ভাবে কারণ স্ত্রীর ওপর তাদের অধিকার আছে বলে আমার রান্না খেতে আরম্ভ করলেন কারণ তিনি বললেন যে আমি নাকি এখন শুদ্ধ হয়েছি। সুতরাং আমার হাতে খেতে এখন আর আপত্তি নেই। কারণ যে বীজে মেয়ের জন্ম তা হল ব্রাহ্মণের বীজ। এই সব ছোট ছোট ঘটনা (ঘটে) বন্ধ ফ্ল্যাটের ভেতরে। জাতের উঁচুনীচু নিয়ে যে সচেতনতা তা ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজা ঢেকে রাখে। আমার এক বান্ধবী আছে যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। প্রথম বিয়ের দরুন তার দুটি ছেলে আছে। সে একজন অফিসার, নাসিকে খুব উঁচু পদে আছে। সে আমাদের বাড়ী নেমন্তন্নে এসেছিল। যেহেতু তারা (আমার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা) জানত যে তার স্বামীর নাম ছিল ওয়াগাদারিকার, ওরা ভেবেছিল যে ব্রাহ্মণ। বাড়ীতে তাই কোনো রাগারাগি হয়নি। আমার শাশুড়ী পরিবেশন করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, "তা কুমুদ, তুমি থাক কোথায়?" সে বলল যে আগে মাহারদের সঙ্গে ছিল। আর তখনই আমরা জানতে পারলুম আমার

শাশুড়ীর কিরকম কুসংস্কারাছন্ন মন। তিনি ভাবলেন যে একটা পাপ ঘটিয়ে বসেছেন। তাঁর হাত থেকে বাসন পড়ে গেল। ব্লাড প্রেশার চড়ে গেল আর তিনি রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। "সাংঘাতিক একটা পাপ করে ফেলেছি। একটা মাহারের মেয়েকে কি আমি বেড়ে খাবার দিতে পারি? হোক না সে অফিসার। আমি আবার ওর থালাও ছুঁয়েছি।", এটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার কারণ আমার শাশুড়ী একজন হেডমিসট্রেস। তাই ভাবি যে স্কুলের ছেলেমেয়েদের তিনি কি শিক্ষাই দিয়েছিলেন। আলাদা আলাদা জাতের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় সেই স্কুলে পড়ত। তাই আমি উর্মিলার অভিজ্ঞতার সঙ্গে একাত্ম হতে পারি। উর্মিলা, জেলেরা আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করত? তাদের রোজকার ব্যবহার কেমন ছিল? জাতভেদ তো কেবল ব্রাহ্মণ আর দলিতদের মধ্যে নেই। তা সব জাতের মধ্যেই আলাদা আলাদা ভাবে আছে। আপনার অভিজ্ঞতায় কি বলে?

উর্মিলা ঃ তারাও জাতিবাদের শিকার। মনুস্মৃতির প্রভাবে এসব হয়েছে। ওই একই কারণে অচ্ছুৎবাদ ইত্যাদিও এসেছে। তোমাদের একটা উদাহরণ দিই যা আমার আত্মজীবনীতেও রাখব। আমার মা আমাদের বাড়ীর পাশে একটা ছোট্ট ঘর করিয়েছিলেন যাতে আমরা সামান্য কিছু ভাড়া পাই। একটি মুসলমান দম্পতি সেখানে থাকতে এল। দুজনেই অল্পবয়সী—স্বামীটি খুব রোগা আর তার স্ত্রীটি খুব সুন্দরী, ফর্সা, খুব সুন্দর গোলাপী গাল, কালো চোখ- খুবই সুন্দরী। স্বামীর নাম ছিল আবদুল্লা দু'জনেই আমাদের ঘরটায় থাকত। তাদের একটি ছেলে ছিল। ছেলেটির রিকেট হয়েছিল। স্ত্রী তো ছেলেটির দেখাশুনো কিছু করত না। আবদুল্লা ছেলেটিকে দেখত। আমার মা পরামর্শ দিতেন "ছেলেকে উঠোনে রোদে খেলতে দাও তাহলে ও সেরে উঠবে।" তাই আবদুল্লা আমার মার সঙ্গে বসে থাকত। সে মাকে বলেছিল যে, সে তার স্ত্রীর মুম্বাইয়ের বাড়ীতে চাকরের কাজ করত। দুজনে মুম্বাই থেকে পালিয়ে এসেছে। স্ত্রীটি মুসলমান, তার স্বামী বিদেশে আছে। সে সেখানে দুটো তিনটে বিয়ে করেছে। যখন স্ত্রীটি বাপের বাড়ী ছিল তখন এর সঙ্গে ভালবাসা হয় আর ওরা স্ত্রীটির বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে এখানে চলে আসে। এই হল কাহিনী। একবার দুটি মেয়ে স্ত্রীটির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল আর সে খুব কান্নাকাটি করেছিল। যে দুজন অল্পবয়সী মেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল মুম্বাই থেকে, তার মধ্যে একজন তার বোন আর অন্যজন তার মেয়ে- আগের স্বামীর দরুণ। সেও খুব সুন্দর দেখতে। দুজনেই মোটামুটি আমার বয়সী, বোনটি এবং মেয়েটি। আমার তাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। রত্নগিরিতে রাজিওয়াড়া বলে একটা মহল্লা আছে যেটা মুসলমান প্রধান। জেলেরা থাকে সেখানে। তারা

মাছ ধরে আর বাজারে বেচে। সেখানে কোনো কোলি জেলে নেই। মুসলমানদের একটা সম্প্রদায় আছে যারা এই কাজ করে। আবদুল্লার কিছু আত্মীয় সেখানে থাকত। যখন সেই আত্মীয়রা মাছ বেচতে আসত। তখন তারা আবদুল্লাকে পরামর্শ দিত "মাহারদের সঙ্গে আছ কেন? তুমি ওখানে চলে এসো।" তারা এরকম বলত, ও তাদের কথা শুনত না। একবার ঈদের সময় স্ত্রীটি কিছু ক্ষীর আর কোর্মা রেঁধে একটা কৌটোয় ভরে বলল, "রাজিরাওয়াড়ায় নিয়ে যাও।" বিরিয়ানী আর অন্য সব সে আমাদেরও দিয়েছিল। আমি যখন খাচ্ছি তখন আমার ভাই বলল, "খাস না, ওতে ষাঁড়ের মাংস আছে। খাস না।" আমার মা বললেন, "আমরা তো মরা জানোয়ারের মাংস খাই, তা এটা খেতে আপত্তি কি, তুই চুপ কর।" তারপর আমরা টিফিন কৌটো নিয়ে রাজিওয়াড়ায় গেলুম। আমরা তো সাবই জেলেদের ব্যাপার জানি, মাছের বাজার কিরকম নোংরা হয়। চারদিক নোংরা। এখানে সেখানে মাছধরার জাল (রয়েছে) পচামাছ, রোদে শুকোচ্ছে মাছ। সব খুব নোংরা। এখানে ওখানে নর্দমা। ঈদ ছিল, সেজন্যে সে ভাল শাড়ী আর গয়না পরে ছিল। যখন অমাকে দেখল তখন তারা খুব রেগে গেল, বলল "তুমি ওখানে বোস।" একটা বেঞ্চি ছিল আমাকে সেখানে বসাল, আর মেয়ে দুটিকে ভেতরে নিয়ে গেল। ততদিনে ওই মেয়ে দুটি আর আমি এত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছি যে আমার মনে হত ওদের ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না আর ওরাও ভাবত আমাকে ছাড়া ওরা বাঁচতে পারবে না। আমরা এত ঘনিষ্ঠ ছিলাম। তারপর তো ওরা বেরিয়ে এলো আর আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে ওরা বলল, "চল আমরা যাই।" টিফিন কৌটোটা তখনো তাদের হাতে ছিল, ব্যাগটাও ছিল। আমরা চলতে আরম্ভ করলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম "কি হল?" ওরা বলল "না-না কিছু না" যখন আমরা এসেছিলাম, তখন আমরা একজন আরেকজনের কাঁধে হাত রেখে এসেছিলাম কিন্তু যখন আমরা ফিরছি তখন সব বদলে গেছে। ওরা হাঁটছিল আর আমি আলাদা হাঁটছিলাম। আর এই ভাবে আমরা ফিরে এলাম। পরে যখন ওরা আমাকে এই ব্যাপারে বলল আমি জানতে পারলাম। বড়জনের নাম ছিল বেবী, সে বলল, "আমরা তো এসব জানতাম না, এটা এখন কে খাবে? খাবারটা তো নোংরা হয়ে গেছে। দিদিকে আমাদের বলতে হবে। জাতের ব্যাপারটা আমরা তো জানতাম না।" তারপর আমরা বাড়ী এলাম। পরদিন সেই আত্মীয়া এল। মা বসে বেতের ঝুড়ি বুনছিল। সে সোজা তার আত্মীয়দের বলল, "তোমরা এই সব গরুমোষের সঙ্গে রয়েছ কেন? চল, আমার সঙ্গে চল।" আর ও তাদের সেই নোংরা আবর্জনার মধ্যে নিয়ে গেল, সেই মাছ ধরার জাল, সেই মাছ। সেখানে নিয়ে গেল। মুসলমানরাও জাতের ব্যাপারকে

খুব গুরুত্ব দেয়-সেদিন আমি বুঝতে পারলাম। সেদিন থেকে মেয়েদুটিকে আমার থেকে পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়া হল। ওরা মুম্বাই চলে এল। সেই বেদনাটা ছোটবেলা থেকে আজও আমার মধ্যে রয়ে গেছে।

১. উর্মিলা যেখানে বড় হয়েছেন সেই রত্নগিরির জেলেরা মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত।

ছাত্রী ঃ মুম্বাইয়ের মত শহরে জাতবিচার কিভাবে কাজ করে?

উর্মিলা ঃ মুম্বাই কসমোপলিটন শহর। এখানে ওই ভাবে জাতিভেদ বোঝা যায় না। কোথায় কোথায় এটা দেখা যায়? যখন সংরক্ষণের প্রশ্ন ওঠে তখন ওরা আমাদের ব্যঙ্গ করে বলে "এরা তো এগিয়ে যাচ্ছে খুব, আমাদের পেছনে ফেলে যাচ্ছে আমাদের যা-কিছু ছিল তা এরা নিয়ে নিচ্ছে।" সত্যি বলতে কি, যখনই আমি সংরক্ষণের কথা বলি তখন আমি ভাবি যে, আমি যা করছি তা ঠিক। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার আগে অবধি সব সংরক্ষণ শুধু উচ্চবর্ণের জন্যেই ছিল। সমস্ত পদ শুধু তাদের জন্যেই রাখা ছিল। যেখানেই যাও না শতকরা একশো ভাগ সংরক্ষণ তাদের জন্যে ছিল। যখন আমাদের সংবিধান গৃহীত হল, তখন তাতে বলা হল যে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষরা এগিয়ে আসবার সুযোগ পাবে। যদি সংরক্ষণ না থাকত, তবে আমি পড়াশুনো করতে পারতাম না। গ্রামে আমার বয়সী কিংবা আমার চেয়ে ছোট মেয়েরা হাটে বাজারে শুকনো কাঠ বেচবার জন্যে বয়ে নিয়ে যায়। তাদের খাওয়ার জন্যে খাবার নেই, পরার কাপড় বা অন্য কিছুই নেই। যদি আমার বাবা আমাদের রত্নগিরি শহরে না আনতেন আর যদি তিনি মাকে আমাদের স্কুলে পড়াশুনো করাবার কথা না বলে যেতেন তবে আমিও একই অবস্থায় থাকতাম। এখানে উপস্থিত থাকতাম না, এখানে কোথাও না...

লতা ঃ এরকম বলা হয় যে আমাদের প্রথম স্ত্রী-শিক্ষিকা, সাবিত্রীবাঈ ফুলে, শিক্ষিকা হয়েছিলেন কারণ (জ্যোতিবা) ফুলে নিজের মতামত জোর করে তাঁর ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। এই সমালোচনা হয়। আবার যখন জাস্টিস রানাডের কথা হয়, তখন সবাই বলে যে, তিনি পণ্ডিতা রমাবাঈকে কত অল্প বয়স থেকে পড়াশুনো করিয়েছিলেন। কিন্তু ফুলের কথা হলে এটা জোর জবরদস্তির ব্যাপার হয়ে যায়। যখন শুনলাম যে ফুলে ১৮৪৮ সালে মেয়েদের জন্যে স্কুল করেছিলেন তখন আমি খুব আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। এটা তো আমাদের ইতিহাসে বা নারী-ইতিহাসে কোথাও উল্লেখ করা নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫০ বা ১৮৫২ তে স্কুল আরম্ভ করেছিলেন। আর সেটাই বলা হয় প্রথম মেয়েদের স্কুল। আমাদের ক্রমিক ইতিহাসে এই ভুল তথ্য ঠিক করে নিতে হবে। সেই অনুসারে সাবিত্রীবাঈ

প্রথম শিক্ষিকা। তিনি না থাকলে আমরা আজ এখানে থাকতাম না। আমরা তো আছি, কিন্তু উর্মিলা এখানে কিছুতেই উপস্থিত থাকতে পারতেন না যদি সংরক্ষণ না থাকত...

উর্মিলা ঃ (সংরক্ষণ সম্বন্ধে কার্য্যশালায় পরে বললেন) সংরক্ষণের দরকার আছে। এটা নিয়ে ওদের ভাবনা চিন্তা করা দরকার আর সংরক্ষণ চালিয়ে যাওয়া উচিত। এখন, জমাদারদের কাজ শতকরা একশো ভাগই মনে হয় দলিতদের জন্যে সংরক্ষিত। কোনো ব্রাহ্মণকে কি তুমি সেখানে দেখতে পাও? সেখানে কি কোনো ব্রাহ্মণ আছে? ওরা সেখানে গিয়ে সংরক্ষণ চায় না কেন? "দয়া করে আমাকেও ঝাঁট দিতে দাও, আমি পায়খানাও পরিস্কার করব। কেন করব না" ...ডক্টর আম্বেদকর বলেছিলেন যে যদি দুটো ঘোড়াকে খেতে দাও, একটা তাগড়া আর ক্ষুধার্ত্ত, অন্যটা দুর্বল আর ক্ষুধার্ত্ত, তাদের সামনে যদি ঘাস রাখো তবে কোনটা বেশী খাবে? তাগড়াটা? না দুর্বলটা? তাই, আগে তাদের সমান হয়ে উঠতে দাও, তারপর তাদের প্রতিযোগিতা করিও।

পারিবারিক ছবি

লতা ঃ আপনাকে একটা ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি একজন লেখিকা, আপনার স্বামী লেখক নন। আপনার এই ধরণের লেখা আর যে খ্যাতি আপনি অর্জন করেছেন তাতে তাঁর কি প্রতিক্রিয়া? আপনার সমসাময়িক যে সব দলিত লেখক, যারা আপনার বন্ধু, লেখক হিসেবে তাদের সম্বন্ধে তাঁর নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় মনোভাব আছে। কিন্তু আজ তো আপনাকেও তাদের মধ্যে গণ্য করা হয়, তো তাঁর কি প্রতিক্রিয়া?

উর্মিলা ঃ ওর ভালোই লাগে। কিন্তু যখন স্ত্রী স্বামীর অগ্রবর্ত্তী হয়ে চলে তখন সবাই স্বামীকে প্রশ্ন করে, সুতরাং একটু হিংসে আর কষ্ট হয়। যেমন আমি যখন 'আমিহি ইতিহাস গড়াওয়ালা'-র (আমরাও ইতিহাস গড়েছি) জন্যে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম তখন মেয়েরা বলেছিল যে যখন তারা আন্দোলনে যোগ দিতে অন্য পুরুষদের সঙ্গে যেত তখন তাদের ব্যঙ্গ করা হত। তাদের স্বামীরা বলত, "ও তোমার পতিরা এসেছে (তোমাকে নিয়ে যেতে) যাও ওদের সঙ্গে গিয়ে স্ফুর্তি কর।" তাই সব স্বামীই এক রকম। বিজ্ঞাপনে যেমন দেখায়, স্বামীরা ঐ রকমই হয়? তারা আবার নিশ্চিত যে তারা সব ভালো স্বামী। কিন্তু (যখন) ওর বন্ধুরা ওকে বলে তোমার স্ত্রী যা লিখেছেন আমরা তা পড়েছি। লেখা ভালো হয়েছে, কিংবা এটুকুও যদি বলে যে আমরা পড়েছি, ও তাহলে বেশ গর্বিত হয়।

লতা ঃ আপনার মেয়েদের কি ব্যাপার? তাদের সাহায্য পান কি?

উর্মিলা ঃ মেয়েরা নতুন যুগের, কিন্তু আমি দেখতে পাই তারা আশা করে যে আমি মায়ের সব কর্ত্তব্য করে যাব। মা ভোরবেলা উঠবে, মা তাদের খাবারের কৌটো গুছিয়ে দেবে, আরো সব। এটা তারা চায়। মা-কে তার কর্ত্তব্য করে যেতে হবে, তারপর মা যা ইচ্ছে করতে পারে। এই তাদের ধরণ। কিন্তু ওরা অতটা সেকেলে নয় যেমন আমার অল্পবয়সে লোকেরা ছিল। যেমন মেয়ে পুরুষেরা সম্পর্কের বিষয়—আমি তাদের আমার পুরুষ বন্ধুদের সম্বন্ধে বলতে পারি। আমার স্বামীকে আমি যদি বলি যে আমি এই ছেলেটিকে আমার ভাই হিসেবে দেখি তবে ও কিছু মনে করবে না। এখন আমার মেয়েরা আছে, ছোটজন লীলাবতী হাসপাতালে ল্যাবরেটারীর টেকনিশিয়ান। বড়জন হাই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

লক্ষ্মী ঃ উর্মিলাজী, আপনি এমন কেন বললেন যে "আমার মনে হয় মেয়েদের জন্যে বিশেষ কিছু করিনি।" এরকম কেন ভাবেন?

উর্মিলা ঃ আমি কি জানি না যে পিতৃতন্ত্রের ভূত আমাদের এখনো তাড়া করে বেড়াচ্ছে—সেটা আমাদের ছাড়েই না। আমি যে এমন মনে করি তার জন্যে পঞ্চাশ ভাগ আমার স্বামী দায়ী। তারও অংশ নেওয়া উচিত ছিল, তারও ভাবা উচিত ছিল—ও পড়ছে, ও কলেজ যাচ্ছে, ও লাইব্রেরীতে যাচ্ছে। কিন্তু সে ভাবল "ও যদি ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো না করে তবে আমিও দেখব না। ওর যা ইচ্ছে করুক গিয়ে।" সে এই ভাবে ভাবত, আর এই সবের মধ্যে আমাদের ছেলেরা আমাদের থেকে দূরে সরে গেল। এক্ষুনি তুমি আমায় জিজ্ঞেস করলে আর আমি ছেলের কথা বললুম...আমার তিনটি সন্তান। বড় ছেলে এম.বি.বি.এস. দ্বিতীয় বছরে পড়ছিল। সে লোকাল ট্রেন থেকে ভীড় আর ধাক্কাধাক্কির জন্যে পড়ে যায়। সে মারা গেল। আগে আমি পড়তাম আর পড়ায় মন বসাতে পারতাম। এখন, যবে থেকে এই ঘটনা ঘটেছে, আমি আর পড়তে পারি না। যাই পড়ি না কেন, একই জিনিষ ভাবতে থাকি। তাই আমি খুব লিখতে আরম্ভ করলাম। এটা ১৯৮৮ তে ঘটেছে। তাই এই দশবছরে আমি আগের চেয়ে বেশী লিখেছি। আমি লেখার মধ্যে পুরোপুরি নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। যখন আমি লিখি তখন কি হয়, আমার মন আর চিন্তাটা একমুখী থাকে আর শুধু লেখার জন্যেই আমি শোচনীয় ঘটনাটার থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি।

লক্ষ্মী ঃ না, কিন্তু যে ভাবে আপনি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারটা হাতে নিয়েছেন খুব কম মা তা করতে পারত। সুতরাং আপনার মেয়ের আপনাকে নিয়ে খুব গর্বিত হওয়া উচিত—যে, তার মা তার পেছনে দাঁড়িয়েছে।[২]

২. উর্মিলার মেয়ে একজনকে ভালবাসত কিন্তু নিজের প্রতি তার অনুভব সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল না। তাই সে সম্বন্ধ করে বিয়েতে রাজী হয়েছিল। বিয়ের কদিন মাত্র আগে ছেলেটি তার ভালবাসা প্রকাশ করে। বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গিয়েছিল আর উর্মিলার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল তাঁর মেয়ের সুখ শান্তি। যাই হোক না কেন উর্মিলা তাঁর মেয়ের পাশে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি বিয়ে আটকাতে পারেননি কিন্তু বিয়েটা রদ করিয়ে দিয়ে, স্বামী এবং আত্মীয়দের মতের বিরুদ্ধে তিনি মেয়েকে তার মনোনীত পাত্রের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন।

লক্ষ্মী ঃ আমার মনে হয় না যে আপনার মেয়ে আপনাকে কখনো একটুও দোষ দেবে। আপনি নিজেকে দোষ দিচ্ছেন যেমন আপনার স্বামী করেন, কিন্তু আপনার মেয়ে এমন ভাববে না।

উর্মিলা ঃ বড় মেয়ে যার বিয়ের সময এই সমস্যা হয়েছিল, সে আমার কাজে বেশ গর্বিত হয়েছিল। "আমি আমার মা-র জন্যেই ভালো আছি," সে এই রকম ভাবত। এখন যে তার স্বামী, সেও বলে, "আপনি তো তখন ঝাঁসীর রাণীর মত লড়াই করেছিলেন। সে জন্যেই আজ আমরা একত্র হতে পেরেছি," সে আমাকে এই কথা বলে।